শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু
শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা

প্রবক্তা

পরমহংসকুলমুকুটমণি জগদ্‌গুরু
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ
বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-আচার্য্য

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ তথা শ্রীচৈতন্য-সারস্বত
কৃষ্ণানুশীলন সংঘের বর্ত্তমান সেবাইত ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য
ত্রিদণ্ডি-দেবগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দমহারাজের

কৃপানির্দ্দেশে

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রপন্ন তীর্থ কর্তৃক

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭ দমদম পার্ক, কলিকাতা - ৭০০ ০৫৫
হইতে প্রকাশিত

বাংলা মর্ম্মানুবাদ

ডঃ দোলগোবিন্দ শাস্ত্রী এম্. এ, পি. এইচ. ডি., (উৎকল), এম্. এ, (সংস্কৃত), এম্. এ. (সাংবাদিকতা, কলিকাতা), কাব্য-ব্যাকারণ-পুরাণতীর্থ, সাংখ্য-বেদান্ত-সাহিত্য-শাস্ত্রী (ঢাকা), অবসর প্রাপ্ত ও.ই.এস, অধ্যক্ষ ডাইরেক্টর, জগন্নাথ রিসার্চ সেন্টার, উড়িষ্যা।

প্রথম বাংলা সংস্করণ

শ্রীল গুরুমহারাজের আবির্ভাব শতবার্ষিকী উপলক্ষে

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা ৩০শে জুন, ১৯৯৫

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭ দমদম পার্ক,
কলিকাতা - ৭০০ ০৫৫
ফোন ঃ ৫৫১-৯১৭৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া,
পিন নং ঃ ৭৪১৩০২
নবদ্বীপ, ফোন ৪০০৮৬

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
বিধবাশ্রম রোড্,
গৌরবাটসাহি, পুরী, উড়িষ্যা
পিন নং ঃ ৭৫২০০১,
ফোন (০৬৭৫২)২৩৪১৩

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালি চিড়িয়ামোড়,
উত্তর চব্বিশ পরগনা

শ্রীল শ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম
দশবিসা, পো ঃ গোবর্ধন, মথুরা
উত্তর প্রদেশ।
ফোন ঃ (০৫৬৫) ৮১২১৯৫।

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
১৫ নং গ্লাডিং রোড্, মেনর পার্ক
লণ্ডন। ফোন ঃ (০৮১)-৪৭৮২২৮৩।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সেবাশ্রম
২৯০০ নর্থ রোডিও গল্চ্ রোড্
সোকেল, ক্যালিফোর্নিয়া - ৯৫০৭৩
ফোন ঃ (৪০৮) ৪৬২-৪৭১২।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত শ্রীধর মিশন
"শ্রীগোবিন্দধাম"
লট ২, বেলটানা ড্রাইভ, টেরানোরা
এন্. এস্. ডব্লিউ। ২৪৮৬ অষ্ট্রেলিয়া।
ফোন ঃ (০০৬১) ৭৫-৯০৪৩৭১।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়ত:

নিবেদন

বিশ্বমঙ্গলময়ী অন্ত্যলীলায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ অশীতিপর বৃদ্ধবয়সেও নবীন যুবকের ন্যায় অফুরন্ত হরিকথা প্রচারোদ্যম প্রদর্শন করিয়া প্রত্যহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভক্তবৃন্দের নিকট যে সমস্ত অমূল্য উপদেশ-রত্নাবলি বিতরণ করিতেন, পরবর্ত্তীকালে তাঁহারই শক্তিসঞ্চারিত সেবকগণ কলিহতজীবের মঙ্গলের জন্য সেই সমস্ত টেপেধৃত রত্নরাজীর মধ্য হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ রত্নাবলী সম্যক্ আহরণ পূর্বক বিষয়ানুসারে বিভাজিত ও সুসজ্জিত করিয়া ইতিপূর্ব্বেই ইংরাজীভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন ও তাহা প্রচুর সমাদরও লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থরত্নটি সেই ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত "শ্রীগুরু এণ্ড হিজ্ গ্রেস্" - এর মর্ম্মানুবাদ। অনুবাদ না বলিয়া মর্ম্মানুবাদ বলিবার কারণ এই যে ইহা হু-বহু অনুদিত নহে। তথাপি বঙ্গভাষাভাষী ভক্তবৃন্দের অধীর আগ্রহ এবং শতবার্ষিকী মহামহোৎসবের মধ্যেই ইহার প্রকাশন-প্রচেষ্টাই আমাদের বিশেষভাবে এবিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। অতএব প্রথমেই আমরা মূল গ্রন্থরাজের আহ্বায়ক, সঙ্কলক, তথা প্রকাশক আমাদের আমেরিকাস্থ আশ্রমের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিনিধি ও পরম সুহৃদ্ শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিবিধান মহাযোগী মহারাজ প্রভৃতি সেবকবৃন্দের সেবাময় প্রচার-প্রচেষ্ঠা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ ও বন্দন করিতেছি। এবং যেকোনো প্রকার ভূল-ত্রুটীর জন্য শ্রীল গুরুমহারাজ ও তদনুগত বৈষ্ণববৃন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বস্তুতঃপক্ষে শ্রীল গুরুমহারাজের হরিকথার সম্যক্ মূল্যায়ণ করিবার মত ব্যক্তিত্ব বর্ত্তমান যুগে খুবই দুর্ল্লভ। তিনি কখন কোথাও কতকগুলি মধুপুষ্পিত বাক্যের দ্বারা মায়াজাল রচনা করিয়া জীববঞ্চনা করেন নাই। পরন্তু তিনি বিভিন্ন স্থানে বিবিধভাবে পারাবারশূন্য গম্ভীর শাস্ত্রীয় বিষয়ের এমনসব বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা, মন্তব্য ও নিগূঢ় ভাব সম্পদের গভীর-বিশ্লেষণ করিয়াছেন, যাহা শাস্ত্র-মর্ম্মজ্ঞেরও মস্তক ঘূর্ণনকারী। উদাহরণ স্বরূপ — তাঁহার গায়ত্রী মন্ত্র বা ঋক মন্ত্রের তাৎপর্য্য বাখ্যা, "মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা" "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা" "বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভিঃ" "ইদং ভাগবতং নাম" প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যা সহজেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার দেওয়া ব্যাখ্যা যে কত সুসূক্ষ্ম নিক্তির ওজনে পরিমিত তাহা একমাত্র তাঁহার ঐকান্তিক চরণাশ্রিত বা কৃপাসিদ্ধ নিজজন ছাড়া অবগত হওয়া অসম্ভব। শুধু বহুমুখী পাণ্ডিত্য বা মেধার দ্বারা পুস্তক অধ্যয়ণ করিয়া তাহার নিগূঢ়ার্থ নিষ্কাশণ করিতে যাওয়া আর সীল্ না ভাঙ্গিয়া বোতলের অভ্যন্তরস্থ মধু আহরণ করিতে

যাওয়া — একই কথা। সেইজন্যই হয়ত আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে তাঁহার আনুগত্যে আমাদের প্রচার সেবার অনুকূলে ১৭০ টির উপর বই এবং মাসিক, পাক্ষিক, সাময়িকী প্রভৃতি মিলিয়ে ১০/১২ টী প্রিয়ডিক্যাল্ প্রকাশিত হইতে থাকিলেও তাহা কখন কোথাও রিভিউ করিতে দিই নাই। একদিন না একদিন তাঁহার কৃপায় তাঁহার অমূল্য অবদান কোন না কোন ভাগ্যবানের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবেই। কেন না "কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী।"

শ্রীল গুরুমহারাজের উপদেশাবলী অদ্যাবধি পুস্তকাকারে বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হইলেও বঙ্গভাষায় খুব বেশী প্রচারিত না হওয়ায় আমরা এই জন্ম-শতবার্ষিকী পূর্ত্তি উপলক্ষে তাঁহার সেবা-সন্তোষ-মানসে এই গ্রন্থরাজের মর্ম্মানুবাদ-বিষয়ে আমাদের পরম বান্ধব ডক্টর্ দোলগোবিন্দ শাস্ত্রীজীর অবদান সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি এবং ইহার প্রকাশনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদভক্তিপ্রপন্ন তীর্থ মহারাজ গ্রহণ করায় আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আমি নিঃসন্দেহ যে আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজ এই গ্রন্থরত্নের মাধ্যমে অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক ও পাঠকবর্গের সকলের প্রতিই তাঁহার অহৈতুকী কৃপামৃত বর্ষণ করিবেন।

শ্রীগুরু-গৌরগান্ধর্ব্বা-গোবিন্দাশ্চ গণৈঃ সহ।
জয়ন্তি পাঠকাশ্চাত্র সর্ব্বেষাং করুণার্থিনঃ ॥

দীনাধম
শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ
ইং ৩০।৫।৯৫

সূচীপত্র

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যসারস্বত মঠের সেবিত
শ্রীশ্রীগুরু - গৌরাঙ্গ - গান্ধর্ব্বা - গোবিন্দসুন্দরজীউ

দিগ্‌দর্শনী

মাত্র দশবৎসরের মধ্যে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ সমগ্র বিশ্বকে কৃষ্ণচেতনার অমৃতধারায় পরিপ্লাবিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাঁরই গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অসীম কৃপাশক্তির প্রভাবে। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামীপাদের একটি রচনার নিম্নপ্রদত্ত উদ্ধৃতিতে তিনি গুরুতত্ত্ব সম্পর্কে যাবতীয় ভ্রান্ত বিকৃত অবধারণাকে খণ্ডন করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, গুরু কোন একটি নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি, আকার বা সংঘের মধ্যে আবদ্ধ নন। গুরুর স্বরূপ সম্পর্কে নিম্ন শ্লোকের প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তকেই শ্রীল মহারাজ উপস্থাপিত করেছেন, —

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্‌ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্‌ ॥

যাবতীয় শাস্ত্র গুরুদেবকে সাক্ষাৎ হরিরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং মহাজনগণ সেইভাবে ভাবিত হয়ে গুরুদেবকে ভগবানের অভিন্ন জেনে উপাসনা করেন। শুদ্ধ ভক্তগণ আরও জানেন যে, গুরুদেব ভগবদভিন্ন হলেও তাঁরই অত্যন্ত প্রিয়জন ও সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক। আমরা এই প্রকার গুরুস্বরূপকে বন্দনা করি।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ সমবেত শ্রোতৃগণকে সম্বোধন করে নিজ বক্তব্য আরম্ভ করলেন,—

প্রিয় সজ্জনবর্গ! গৌড়ীয় মিশনের বম্বে শাখার সেবকগণের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের স্বাগত অভিনন্দন জানাই। কারণ আপনারা কৃপা করে আমাদের আচার্য্য বিশ্বগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ৬২তম শুভ আবির্ভাব তিথি উৎসবে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদনে সমবেত হয়েছেন। বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সভাপতি আচার্য্য শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর অর্থাৎ আমার গুরুদেব সমগ্র বিশ্বে কৃষ্ণভক্তি প্রচারের জন্য বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয় মিশন স্থাপন করেছিলেন।

শ্রীল সরস্বতী-ঠাকুর আজ থেকে ৬২ বৎসর পূর্বে আজকের এই তিথিতে তাঁর

পিতৃদেব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আহ্বানে শ্রীক্ষেত্র পুরী জগন্নাথ ধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

সজ্জনমণ্ডলী, এই পবিত্র সন্ধ্যায় আজ এই যে অর্ঘ্য নিবেদনের আয়োজন করা হয়েছে, তা কোন সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান বিশেষ নয়। শ্রীল আচার্য্যদেব কোন গোষ্ঠীবিশেষের গুরু নন, তিনি সমগ্র বিশ্বের শিক্ষাগুরুর আসন গ্রহণ করে সমগ্র জগদ্‌বাসীকে উদ্ধার করতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি কেবল আমারই গুরুদেব নন, তিনি সর্বজীবের ত্রাণকর্ত্তা গুরুতত্ত্বের মূর্ত্তবিগ্রহ। গুরুতত্ত্ব এই জগতে অবতীর্ণ হয়ে জীবকে কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করার উপদেশ প্রদান করেন।

মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে,—

তদ্‌বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

মুণ্ডক ১।২।১২

অপ্রাকৃত বিজ্ঞান লাভ করার জন্য শিষ্য-সাধক প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠ শাস্ত্রমর্মবেত্তা গুরুপরম্পরার নিকট আত্মসমর্পণ করবে।

এই ভাবে শাস্ত্র নির্দেশ দিয়েছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান বা অপ্রাকৃত বিজ্ঞান লাভের জন্য গুরুর শরণাগত হতেই হবে। ভগবান্ যেমন এক বা অদ্বিতীয়, গুরুও সেই প্রকার অনেক হতে পারেন না। তত্ত্বদৃষ্টি থেকে গুরু একজনই, বহু হতে পারেন না। যাঁর আবির্ভাব তিথিতে আজ আমরা সমবেত হয়েছি, সেই আচার্য্যদেব কোনও সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানের একজন গুরু নন, কোন এক বিশেষ দর্শন-শাখার প্রবর্ত্তক আচার্য্য নন, উপরন্তু, তিনি আমাদের সকলের গুরু। তফাৎ মাত্র এই যে, আমরা তাঁর নির্দ্দেশ মেনে সর্বতোভাবে তাঁকে স্বীকার করি, অপরে তা করে না।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে বলা হয়েছে,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ
নাবমন্যেত কর্হির্চিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত
সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

ভাঃ ১১।১৭।২৭

“গুরু বা আচার্য্যকে আমার সমান বলেই জানবে। তাঁর প্রতি কেউ মৎসর হবে না

বা তাঁকে সাধারণ মনুষ্য বলে অবজ্ঞা করবে না। কারণ গুরুই সমস্ত দেবতার সম্মিলিত স্বরূপ।" এত' স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

তাই গুরুকে ভগবানের সঙ্গে সমান করা হয়েছে। তিনি কোন জাগতিক ব্যক্তিবিশেষ নন। আমরা জীবন যাত্রায় অহরহ যে সুখ ও স্বাধীনতার জন্য লালায়িত, গুরু সেই নিত্য সুখ ও আনন্দ বিতরণের জন্য, সমগ্র বেদের প্রতিপাদ্য দিব্য আলোকের সন্ধান দেওয়ার জন্যই আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হন।

বেদের অপ্রাকৃত বিজ্ঞান প্রথমে ভগবান্ এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট ব্যক্ত করেছিলেন। ব্রহ্মা থেকে নারদ, ব্যাসদেব, তাঁর থেকে মধ্ব — এই ভাবে শিষ্য পরম্পরা ক্রমে সেই বিজ্ঞান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পর্য্যন্ত এসেছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্যত্ব লীলার অভিনয় করে সেই বিজ্ঞান তাঁর অনুগত শ্রীরূপ গোস্বামি গণের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন। বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর সেই রূপ গোস্বামীর দশম প্রতিনিধি। আমরা শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট যে বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছি, তা সেই বিজ্ঞান, যা ভগবান্ ব্রহ্মার হৃদয়ে সঞ্চারিত করেছিলেন।

আজকের এই তিথিকে আমরা ব্যাসপূজাতিথি রূপে পালন করছি; কারণ আমাদের গুরুদেব সেই শ্রীবেদব্যাসের জীবন্ত প্রতিনিধি — যিনি বেদ, পুরাণ, ভগবদ্‌গীতা, মহাভারত ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের সংকলন কর্ত্তা।

আমরা নিজেদের অসম্পূর্ণ, সীমিত ক্ষুদ্র মানসিক কসরতের মাধ্যমে সেই অপ্রাকৃত ভূমিকার বিজ্ঞান সম্পদ লাভ করতে পারিনা। কিন্তু শ্রীব্যাসদেবের অবিচ্ছিন্ন পরম্পরাগত গুরুপাদপদ্মে কেবল শ্রুতি মাধ্যমেই তা পেতে পারি, সেই ব্যাসদেবের অভিন্ন শ্রীগুরুদেবের চরণে শরণাগতি দ্বারা আমরা নিজেদের অহংভাব জনিত ভাবনা থেকে মুক্ত হতে পারি।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে, —

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

গীতা - ৪।৩৪

"যথার্থ তত্ত্বদর্শী গুরুদেবের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা পরমার্থ বিজ্ঞান প্রাপ্তির সাধনা কর। তা হলে তিনি তোমার নিকট সেই রহস্য উন্মোচন করবেন; কারণ তিনি অদ্বয় পরতত্ত্বের দর্শন করেছেন।"

অপ্রাকৃত বিজ্ঞান লাভের জন্য আমাদের প্রকৃত আচার্য্যের নিকট সর্বাত্মনিবেদিত হয়ে পরিপ্রশ্ন ও সেবার মনোবৃত্তি দ্বারা সাধনা করতে হবে। আমরা স্বীকার করি যে, সেই আচার্য্যদেবের নিকট আমরা পরিপূর্ণ শরণাগত হতে পারি নাই, তথাপি এটা অনুভব করেছি যে, তিনিই ত্রিতাপ-দগ্ধ মানবজাতির ত্রাণকর্ত্তা এবং তাঁর শ্রীমুখের বাণী বিনা প্রতিবাদ ও সন্দেহ নির্মুক্ত চিত্তে শ্রবণ করলে তাঁর কৃপালাভ করতে পারব। নিজের স্বধামে ফিরে যাওয়ার একমাত্র অবলম্বন তাঁর উপদেশবাণী শ্রবণ ও তাঁর চরণে সর্বাত্মনিবেদন।

ভগবান্ কি তত্ত্ব, তাঁর সঙ্গে আমাদের কি প্রকার সম্পর্ক, এই বিশ্ব সংসার কি, এই সব প্রশ্নের মীমাংসার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই মর্ত্ত্য ভূমিতে সবই মরণশীল, ক্ষণস্থায়ী। আজ থেকে সাড়েচারশত বৎসর পূর্বে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়ে নিত্য নিকেতন চিন্ময় গোলোকের কথা বিতরণ করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে কিছু অন্যাভিলাষী তথাকথিত গুরু চৈতন্যচেতনাকে কৃষ্ণচেতনাকে বিকৃত করে জনসমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। তার ফলে শ্রীচৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ আবৃত্ত হয়ে গেল এবং জনসমাজে এক নিন্দিত হেয় স্তরে নেমে গেল। সুখের কথা, আমাদের আচার্য্য কৃপা করে আমাদের সেই অবনমিত স্তর থেকে তুলে নিয়েছেন, সেই জন্যই আমরা আজ নত মস্তকে তাঁর শরণ গ্রহণ করেছি। তিনি আমাদের চক্ষু খুলে দিয়েছেন।

আমরা আরও আনন্দিত হয়েছি যে, আমরা সেই ধর্মবিকৃত পরিবেষ্টনী থেকে মুক্তিলাভ করেছি এই আচার্য্য ভাস্কর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের কৃপায়, তিনি আমাদের দিগ্‌দর্শক, পথ-প্রদর্শক নিত্যপিতা।

সহৃদয়গণ! যদিও আমরা পরমার্থতত্ত্বের বিচারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ শিশু, আমাদের গুরুদেব আমাদের হৃদয় থেকে অজ্ঞান অন্ধকার দূর করার জন্য একটি আলোকরেখা সঞ্চারিত করে দিয়েছেন, যার দ্বারা আজ আমরা কোনপ্রকার তথাকথিত দার্শনিকের কুতর্ক কুয়াশায় পথহারা হব না। কেউ আমাদের পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হবে না। তাঁর চরণ থেকে একটুও বিচ্যুত করতে পারবে না।

সজ্জনগণ! তিনি যদি আবির্ভূত না হতেন, তবে আমরা চিরদিনের জন্য ঐ মায়াজালের ঘনতমিস্রায় জন্ম জন্ম ধরে অসহায়ভাবে ঘুরপাক খেয়েই চলতাম। তিনি না আসলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্মল বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি মার্গের সন্ধান আমরা পেতে পারতাম না।

ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন আশা-ভরসাই ছিল না যে, আমি কোন দিন এই জন্ম-মরণ মায়াজাল থেকে উদ্ধার পাব। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, আমি যাঁর চরণাশ্রয়ে এসেছি, আমার নিজ কর্মফলে যত যাতনাই ভোগ করি না কেন, একদিন সেই গুরুদেবের অহৈতুকী করুণা পাবই। আমি অত্যন্ত অযোগ্য হলেও কৃষ্ণের দাসানুদাস, এ অনুভব আমার গুরুদেবের কৃপা প্রসাদেই লাভ করেছি, তাই আজ আবার তাঁরই শ্রীচরণে বিনম্র প্রণাম নিবেদন করি।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের এই বক্তৃতা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ৬২ তম আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে হার্‌মোনিষ্ট্ পত্রিকায় প্রকাশিত।

ভূমিকা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

ভুল করা হল মানবপ্রকৃতি। সকলেই আমরা কোন না কোন সময় ভুল করব বা বিপথগামী হব, এ আমাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, কারণ আমরা এখনও পরিপূর্ণতা লাভ করিনি। তবুও আমরা কেউই অপরিপূর্ণ হয়ে থাকতে চাই না। সকল জীবসত্ত্বার মধ্যে এমন একটি গুণ আছে যার স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে পরিপূর্ণতা লাভ করার দিকে। তা যদি না হত তাহলে আমরা কখনও কোন অভাব অনুভব করতাম না। পরিপূর্ণতা লাভ করার দিকে আমাদের এই যে প্রবণতা তা নিশ্চয়ই খুব দুর্বল ও সীমিত; তা না হলে আমরা খুব শীঘ্রই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারতাম। পরিপূর্ণতা লাভ করার পথে আমাদের ক্ষমতা ও প্রবণতা যে সীমিত সেই কারণেই আমাদের জীবনে গুরুর বা পথনির্দ্দেশকের প্রয়োজন আছে।

যে অপরিপূর্ণ সে অপরিপূর্ণ হত না, যদি তার সাহায্যের দরকার না থাকত এবং এই সাহায্য তাকে অবশ্যই বাইরে থেকে পেতে হবে। যিনি পরিপূর্ণ তাঁকেও পরিপূর্ণ বলা যায় না যদি তিনি নিজেকে প্রকাশিত করতে না পারেন এবং অন্যকে সাহায্য করতে না পারেন এবং সেটাও তাঁর স্ব-ইচ্ছায়। সুতরাং যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ বা ভগবৎস্বরূপ তাঁর দিকে পৌঁছবার পথনির্দ্দেশনা করাটাও তাঁরই একটি স্বাভাবিক ধর্ম বা ক্রিয়া এবং তাঁর যে দিব্য প্রতিনিধির মাধ্যমে তাঁর এই ক্রিয়া সম্পন্ন বা প্রকাশিত হয় তিনিই হলেন শ্রীগুরুদেব বা আমাদের জীবনের দিব্য পথনির্দ্দেশক।

যিনি পরমসত্যের বা ভগবৎস্বরূপের অনুসন্ধান করছেন, তাঁর পক্ষে গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করাটা জীবনের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। এক ধরণের চিন্তাবিদ আছেন যাঁরা মনে করেন আমাদের পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা যখন সম্ভব তখন উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক জ্ঞানই বা কেন ক্রমশঃ ক্রমশঃ আমাদেরই ভেতর থেকে প্রকাশ পাবে না বা বিবর্তিত হবে না। এই ধরণের লোকদের — যিনি পরমজ্ঞান ও পরমজ্ঞেয়, সেই ভগবৎস্বরূপের মৌলিক প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ বলা যেতে পারে, কারণ তাঁরা জানেন না যে একমাত্র তিনিই হলেন পরমকর্ত্তা এবং আর সবকিছুই ও আমরা সকলেই তাঁর সর্বজ্ঞ দৃষ্টির সামনে তাঁর ইচ্ছার নিমিত্ত মাত্র হয়ে অবস্থান করছি। চোখের পক্ষে মনকে দেখা

অসম্ভব, তখনই চোখের মনের সঙ্গে সম্পর্ক হবে, যখন মন তার দিকে মন দেবে। সেই একই ভাবে ভগবৎস্বরূপের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠাটাও তাঁরই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সেজন্যে আমাদের অবশ্যই ঐকান্তিক ভাবে তাঁরই প্রতিনিধির বা আধ্যাত্মিক শিক্ষকের (অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের) উপর নির্ভর করতে হবে যাঁর মধ্যে দিয়ে শ্রীভগবান্ নিজেকে বিতরণ করতে চান।

যিনি চিরগতিশীল অসীম সত্ত্বা, তাঁর মধ্যে আমাদের এই মানবসমাজ তাঁর সর্বোত্তম সংস্কৃতি নিয়েই এক অতি ক্ষুদ্র স্থান অধিকার করে আছে। তাই আমরা কি করে আশা করতে পারি যে কোন প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট দিব্যপ্রকাশের মাধ্যম ছাড়া, যিনি অসীম ও অধোক্ষজ, তাঁর সম্বন্ধে অলৌকিক জ্ঞানের উপলব্ধি বা ধারণা আমাদের হতে পারে? যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান পরমপুরুষ, তাঁর সামনে বিরাট বুদ্ধিজীবি পণ্ডিতদেরও পিগ্‌মীর মত ক্ষুদ্র মনে হবে, কারণ তাঁকে বিতরণ করার অধিকার কেবল তাঁরই আছে এবং সেটা তিনি কেবল তাঁর নিজস্ব প্রতিনিধিদের মধ্যে দিয়েই করেন।

তবে আমাদের জ্ঞান ও নিষ্ঠা দিয়ে যতটা সম্ভব আমাদের সতর্ক থাকা উচিত যেন আমরা কোন মেকী গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ না করি। অবশ্য এক্ষেত্রে আমরা নিজেদের খুব বেশী সাহায্য করতে পারি না, কারণ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা প্রধানতঃ আমাদের পূর্ব সংস্কার দ্বারা চালিত হচ্ছি। (ইংরিজিতে একটা কথা আছে) "এক জাতের পাখীরা একই সঙ্গে ঝাঁক বাঁধবে" (অর্থাৎ আমাদের পূর্বসংস্কার অনুযায়ীই আমরা কারোর প্রতি আকৃষ্ট হব বা হব না)। যদিও সাধারণতঃ আমরা অভ্যাসেরই অধীন, তবুও আমাদের এই মানবজন্মে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা বা মতামতও কিছুটা কাজ করে, তা না হলে আমাদের শোধন করাটা অসম্ভব হত এবং সে ক্ষেত্রে দণ্ড দেওয়াটা কেবল প্রতিহিংসার কাজ হত। যিনি পরমসত্য তিনি ইচ্ছে করলেই নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশিত করতে পারেন। আলো তার স্বরূপ প্রমাণ করার জন্যে অন্ধকারের উপর নির্ভর করে না। সূর্য নিজে নিজেই আর সব আলোর চেয়ে নিজের উৎকর্ষতা প্রমাণ করতে পারে। যাঁর দৃষ্টি উন্মুক্ত ও নিরপেক্ষ, তাঁর সামনে অন্য সব জাগতিক নিয়মের শিক্ষাদাতাদের ম্লান করে দিয়ে সদ্‌গুরুর স্বরূপ জাজ্বল্যমান হয়।

শ্রীগুরুদেব নিজেকে দুভাবে প্রকাশিত করেন — অন্তরে তিনি নির্দ্দেশক (চৈত্ত্য গুরু) হয়ে আর বাইরে তিনি উপদেশক হয়ে বিরাজ করেন। পরমেশ্বরের এই দুইরকমের ক্রিয়াই জীবাত্মাকে বা সদ্‌গুরুর শিষ্যকে সাহায্য করে তার চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে। অন্তরে অবস্থিত নির্দ্দেশক (চৈত্ত্য গুরু) হয়ে আমাদের যে প্রকৃত পথের নির্দ্দেশ দেন, তা আমাদের পতিত অবস্থায় আমরা সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। তাই করুণার

মূর্ত্তবিগ্রহ যে উপদেশক, শ্রীগুরুদেব হয়ে বাইরে বিরাজ করছেন তিনিই আমাদের একমাত্র আশা ও ভরসা। কিন্তু এই সঙ্গে এটাও ঠিক যে চৈত্ত্য গুরুর কৃপাতেই যে সদ্‌গুরু বাইরে বিরাজ করেন তাঁকে আমরা চিনতে পারি ও তাঁর পবিত্র পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করতে পারি।

যে প্রকৃত শিষ্য সে সর্বদাই এই তথ্য সম্বন্ধে সজাগ থাকবে যে তার যে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক সম্পদ সে কেবল পরমেশ্বরের কৃপার দান মাত্র এবং এটা কোন অধিকারের ব্যাপার নয় যেটা দাবী করা যায় বা জিতে নেওয়া যায়। আমাদের সহজাত প্রকৃতি অনুযায়ী আমরা কেবল শ্রীভগবানের কৃপার দান গ্রহণে সমর্থ। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা পরিস্কারভাবে উপলব্ধি করা উচিত, সেটা হল জীবাত্মা কখনও পরমপুরুষের সঙ্গে প্রকৃত পক্ষে এক হতে পারে না। জীবাত্মা তার মুক্ত বা সিদ্ধ অবস্থাতেও কখনও ভগবৎস্বরূপের সমান বা তাঁর সঙ্গে একাত্মা হতে পারে না। শ্রীভগবানের সঙ্গে তাঁর সচ্চিদানন্দময় ধামের দিব্যজ্যোতির যে পার্থক্যটা আছে সেটা ভুলে যাওয়ার অজ্ঞান তামসিকতার থেকেই এই ভুল ধারণাটার প্রবর্ত্তন হয়। প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা কেবল শ্রীভগবানের এমন একটা শক্তির (তটস্থা শক্তি) অংশ যেটা তাঁর একটা মধ্যম মানের শক্তি (অন্তরঙ্গা শক্তি সর্বোচ্চ আর বহিরঙ্গা শক্তি সর্বনিম্ন মানের শক্তি)। সেজন্য জীবাত্মা দুদিক (অর্থাৎ চিন্ময় জগৎ ও প্রাকৃত জগৎ — এই দুদিক) থেকেই প্রভাবিত হতে পারে। ভগবৎস্বরূপের সঙ্গে জীবাত্মার গুণগত ও পরিমানগত দুরকমের পার্থক্যই আছে এবং তাঁর উপরে সে নিতান্তভাবেই নির্ভরশীল। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হলেন প্রভু আর জীবাত্মা তার স্বাভাবিক প্রকৃতিবশেই তাঁর অনুগত সেবক।

এই যে সম্বন্ধ এ হল নিত্য এবং জীবাত্মার পক্ষে পরম মঙ্গলদায়ক ও পুষ্টিকর। ক্রীতদাসত্বের আশংকা এই সম্বন্ধের মধ্যে আসে না কারণ এর মধ্যে রয়েছে জীবাত্মার স্বাধীন ইচ্ছা ও তার পরম লাভ। পরম মঙ্গলময়ের কাছে আত্মসমর্পণ করলে শুধু যে জীবাত্মার স্বাধীনতা ও নিজস্ব ব্যক্তিত্বের হানি হয় না তাই নয়, পরন্তু একমাত্র তাঁর মধ্যেই এই স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব সত্যিকারের সমৃদ্ধি লাভ করে। যেখানেই শ্রীভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, সেখানেই জীবাত্মার ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নিজস্ব অধিকারও সেই সম্পর্কের অপরিহার্য্য অঙ্গ রূপে আছে। তাই মাছ যেমন জলে আর পশু যেমন বনে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তেমনি সেই জীবাত্মারাও সেই সম্পর্কের মধ্যে খুব স্বচ্ছন্দে থাকেন। কিন্তু শ্রীভগবানের যে স্বাধীনতা ও অন্যান্য গুণ আছে তা হল অপরিমিত ও অপ্রাকৃত এবং তার সেই অপরিমিত শক্তির কেবল আংশিক ক্রিয়ার দ্বারাই তিনি সমস্ত জীবজগতের সমন্বয় সাধন করেন।

শ্রীগুরুদেব সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানের সমান নন। কিন্তু তিনি শ্রীভগবানের পূর্ণসত্ত্বা ও তাঁর শক্তির সারাংশের ও তাঁর সম্পূর্ণ ও সর্বোত্তম সেবার ও করুণার প্রতিমূর্ত্তি। যেহেতু তিনি শ্রীভগবানের সবচেয়ে যোগ্য সেবক তাই শ্রীভগবান তাঁকে বিশেষ শক্তি দিয়েছেন সমস্ত বিপথগামী জীবকে তাদের সর্বোত্তম স্বার্থের সন্ধান দিতে। এই মৃত্যুময় ও দুঃখময় পৃথিবীতে অমৃতময় আশা ও আনন্দের দিব্যদূত হলেন শ্রীগুরুদেব। তাপিত, পীড়িত জনগণের জন্য তাঁর আবির্ভাবই সবচেয়ে শুভ ও আনন্দদায়ক ঘটনা। এর তুলনা হতে পারে একমাত্র প্রভাতের শুকতারার সঙ্গে, যা কিনা মরুভূমিতে দিগ্‌ভ্রান্ত যাত্রীকেও পথ দেখাতে পারে। শ্রীগুরুদেবের করুণাময় হস্তের কোমল স্পর্শই সমস্ত অশ্রুপ্লাবিত নয়নের অবিরাম অশ্রুকে মুছিয়ে দিতে পারে। দেশপ্রেমিকরা বা সমাজসেবকরা তাদের প্রাণপণ ব্যর্থ প্রয়াসের দ্বারা কেবল পীড়িত মানুষের গভীর সমস্যাকে আরও ঘণীভূত করে তোলে, যেমন অজ্ঞ চিকিৎসক দুর্ভাগা রোগীর চিকিৎসা করেন। আহা, সেইদিন কবে আসবে যেদিন এই দুর্ভাগা জীব শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী করুণা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

ইংরেজীতে রচিত এই প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় "দি হার্‌মোনিস্‌ট্‌" পত্রিকায়, ১৯৩৪ সালে।

অধ্যায়-১

শ্রীগুরুদেবে শরণাগতি

কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কোনটা কর্ত্তব্য, কোনটা অকর্ত্তব্য বুঝতে গিয়ে বড় বড় বিদ্বান্‌গণেরও মাথা ঘুরে যায় (কিং কর্ম কিম্ অকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ)। মহা মহা মনীষিগণও তাঁদের প্রকৃত প্রয়োজনটা কি তা ঠিক করতে পারেন না। এই জড় জগৎটা নানা জটিলতার একটা জঙ্গল, এখানে আত্মা নানা চেতনার সঙ্গে নানাবিধ দেহ ধারণ করছে। বিষ্ণুপুরাণে পাই,—

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতি।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ ॥

জলচর জন্ম ন'লক্ষ, স্থাবর বা বৃক্ষ লতা বিশ লক্ষ, কীট ও সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী এগার লক্ষ, আকাশচর পক্ষী দশ লক্ষ, চতুষ্পদ পশু ত্রিশ লক্ষ এবং মনুষ্য জন্ম চার লক্ষ। মনু বলেন, বৃক্ষ লতার প্রাণ থাকলেও তারা নিজকর্মের ফলস্বরূপ ঐ প্রকার অবস্থা লাভ করেছে। তাদের সুখ-দুঃখাদি অনুভূতি আমাদের মতই। তাদের আত্মাও আমাদের আত্মার চেয়ে ন্যূন নয়। তথাপি তারা নিজ নিজ কর্মফলের দরুণ ঐ প্রকার শোচনীয় অবস্থা লাভ করেছে। এ জন্য অন্য কেউ-ই দায়ী নয়। বাহ্য জগতের ব্যাপার এই প্রকার।

আমরা এমনই একটা পরিস্থিতিতে বাস করছি, যেখানে কেবলই প্রচণ্ড ভ্রান্ত ধারণা, ভুল বোঝাবুঝি, ভুলপথে চালিত হওয়া এবং অবিচার অত্যাচার ভরপুর রয়েছে। কোনটা ভুল কোনটা ঠিক, কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, কোনটা ধরব কোনটা ছাড়ব, এসব কি করেই বা স্থির করব? কতরকম ঝামেলা এক সঙ্গে এসে আমাদের প্রভাবিত করতে আসে। যখন এই প্রকার মায়াজালে পড়ে আমরা নানাবিধ বিপরীত পরিস্থিতিতে হাবুডুবু খাচ্ছি, তখন অনন্ত বৈকুণ্ঠ জগতের সাধনপথ পাওয়ার আশা আমরা কেমন করেই বা করতে পারব! যে চিন্ময় জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত, অধোক্ষজ, সেই জগতে যেতে হলে আমাদের দৃষ্টিকোণ কি প্রকার হওয়া দরকার — এই সব চিন্তার বিষয়।

প্রকৃত গুরু

সেই জগতে, সেই চিন্ময় ধামে প্রবেশ করতে সাহায্য করতে পারে, এমন কোন পথ বা সাহায্য আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। আমাদের অন্তরের আশাবন্ধের অনুকূল একটু সম্বন্ধ পেলেই তাকে স্বীকার করে নিতে হবে। কারণ, আমরা ত' একান্তই সহায়-সম্বলহীন, একান্ত অসহায়, নৈরাশ্য সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি, সমূহ বিপদে পড়ে গিয়েছি। আমাদের নিজস্ব সম্বল, বুদ্ধি-বিচার, প্রকৃত কল্যাণ কিসে হয়, তা বুঝে নেওয়ার জ্ঞান, এত অকিঞ্চিৎকর, এত সামান্য যে, তার উপর আমরা ভরসাই করতে পারি না। সবই ত' দেখছি, চারদিকেই বিপদ! এ অবস্থায় একজন প্রকৃত পথ-প্রদর্শক, প্রকৃত গুরুর আবশ্যকতা যে কত, তা আমাদের অনুভব করা দরকার।

আমরা এমন একটি অবস্থার মধ্যে পড়েছি, যেখানে নানা প্রকার শক্তি আমাদের নিরন্তর নানা দিকে আকর্ষণ করে চলেছে। তাই একজন শক্তিমান ব্যক্তির আনুগত্য নিশ্চয়ই প্রয়োজন। সকলের সব রকম নির্দ্দেশ মেনে চলা কঠিন। তই প্রকৃত নির্দ্দেশটা কি, তা জানবার প্রযত্ন আমাদের নিতান্তই আবশ্যক। সেই প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ ভগবান্ কৃষ্ণ নিজেই শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতাতেই দিয়েছেন, —

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

পরমার্থ জগতের জ্ঞানলাভের জন্য আত্মজ্ঞানলব্ধ সদ্‌গুরুর সমীপে যেতে হবে, নিজের ইষ্টদেব রূপে তাঁর চরণে শরণাগত হতে হবে। দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা তাঁর সন্তোষ বিধান করতে হবে। সেই তত্ত্বদর্শী স্নিগ্ধ শিষ্যের হৃদয়ে আত্মজ্ঞান সঞ্চার করেন; কারণ তিনি সত্যদ্রষ্টা।

শিষ্যের যোগ্যতা

এই সংসারে কৃষ্ণ সাধু গুরুর দ্বারা আমাদের হাতে একটি মাপকাঠি ধরে দিয়েছেন, যার সাহায্যে কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ, তা আমরা ঠিক করে নিতে পারি। এই যে মাপকাঠি তা কোনও দূষিত ভূমিকা থেকে এলে চলবে না। তা অপ্রাকৃত ভূমিকা থেকে আসা চাই, এবং তার অনুভূতির জন্য আমরা যারা শিষ্য হতে চাই, তাদের তিনটি যোগ্যতা চাই, তাহল — প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা।

প্রণিপাত অর্থ আমরা সেই জ্ঞানের নিকট নিজেকে সমর্পণ করে দেবো, তার কাছে

সম্পূর্ণ প্রণত হয়ে যাবো, কারণ তা সাধারণ জাগতিক অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান নয়; তাকে আমরা জ্ঞাতা হয়ে আমাদের জ্ঞাতব্য বস্তু রূপে গ্রহণ করে নিতে পারি না। সেই জ্ঞান আধোক্ষজ বা ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের, বুদ্ধির বা মেধার বিষয় বস্তু হতে পারে না। আমরা এই জগতের জ্ঞাতা হতে পারি, কিন্তু সেই পরজগতের জ্ঞানের নিকট আমরা নিজেকে জ্ঞাতা না হয়ে জ্ঞাতব্য রূপে সমর্পণ করে দিতে হবে।

'প্রণিপাত' শব্দের আরও অর্থ হচ্ছে, শিষ্য গুরুর পদপ্রান্তে উপনীত হয়ে বলে, এই জগতের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে আমি জর্জ্জরিত হয়ে শেষ হয়ে গিয়েছি; এই জড় জগতের কোন কিছুর প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই, কোন কিছুই আমার ভাল লাগে না, আমি এখন আপনার শ্রীচরণে নিজেকে অর্পণ করে দিলাম, আপনার কৃপা আমার চাইই। এই প্রকার মনোভাব নিয়েই আমরা সেই অধোক্ষজ জ্ঞান লাভের অধিকার পেতে পারি।

'পরিপ্রশ্ন' অর্থ আন্তরিক নিষ্কপট জিজ্ঞাসা, আমরা কেবল কৌতূহল নিবৃত্তি, সাধারণ আলোচনা বা কেবল তর্ক করার মনোভাব নিয়ে যে প্রশ্ন করি তা এই শাস্ত্রীয় পরিভাষার পরিপ্রশ্ন নয়। আমাদের সন্দেহ ও অশ্রদ্ধা মনোভাব না রেখে কেবল মাত্র বাস্তব সত্যকে অনুভব করা, যথার্থ মার্গের প্রতি আমাদের যাবতীয় প্রযত্ন কেন্দ্রীভূত হওয়া দরকার। আমাদের সমগ্র সত্তা ও একাগ্রতা দিয়ে সেই সত্যকে অনুভবের মধ্যে আনতে হবে কারণ সেই সত্য এমন একটা ভূমিকা থেকে কৃপা করে অবতরণ করবেন, যে ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের পূর্বের কোন ধারণাই নাই।

শেষের কথা, 'সেবয়া' অর্থাৎ সেবা। এইটিই সবচেয়ে মুখ্য। আমরা এই যে জ্ঞান লাভ করতে চাচ্ছি, তাকে এই জগতের কোন কাজে লাগাবার জন্য নয়। এই জগতে আমরা যে ভালোভাবে বাস করবো এই জন্যও নয়, পরন্তু যাতে আমরা এই জগৎ ছেড়ে সেই জগতের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করতে পারি তার জন্যই। এই রকম বিচার ধারা ও মনোবৃত্তির দ্বারাই আমরা ঐ জ্ঞানের রাজ্যে পৌঁছাতে পারি। আমরা সেই দিব্যজ্ঞানের সেবা করব। তাকে আমাদের সেবায় লাগাবার জন্যে কখনই চেষ্টা করব না। কারণ এই রকম প্রবৃত্তি থাকলে আমরা সে রাজ্যে প্রবেশ করতে পারব না। অধোক্ষজ জ্ঞান এই নিম্ন ভূমিকায় সেবা করার জন্য কখনই নেমে আসবে না। আমরা নিজেকে তার সেবার জন্যে অর্পণ করলেই তার কৃপা পাওয়া যাবে। আমাদের নিজের স্বার্থ বা নিজের জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্যে তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করা হবে না।

কেবল সেবা মনোভাব নিয়েই নিশ্চয়ই আমরা তাঁর সেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করব। তিনি আমাদের পশু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবেন এমনটি কখনও চিন্তা করা উচিত নয়, এই সেবা প্রবৃত্তির দ্বারাই আমাদের যথার্থ বোধশক্তির উদ্রেক হবে; তার পরেই

আমরা কোনটা কি, তা ঠিক ভাবে জানতে পারব এবং আমাদের চারিদিকের প্রকৃত অবস্থা বুঝে নিতে পারব।

এইটাই হচ্ছে বৈদিক সংস্কৃতি। অদ্বয় জ্ঞান এইভাবেই শিষ্যপরম্পরায় নেমে এসেছে। কোন জাগতিক জ্ঞানপন্থার মাধ্যমে তা লাভ করা যাবে না। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর এ বিষয়ে মৌমাছির উপমা দিতেন। কাচের বোতলে মধু রয়েছে, বোতলের ছিপিটাও ভাল করে আঁটা আছে। মৌমাছি কাচের বোতলের উপর বসে মৌ ছাখ্‌বার জন্য বোতলটাকে চাট্‌ছে। কিন্তু বোতলটাকে চেটে যেমন মৌমাছি মৌ খেতে পারে না, সেই রকমই জড় জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা পরাবিদ্যার রস আস্বাদন করা যেতে পারে না, সে জগতে ঐ ভাবে যাওয়া যেতে পারে না। আমরা কেবল মনে মনে চিন্তা করতে পারি যে, আমরা সেখানে পৌঁছে গেছি, সেই জ্ঞান পেয়ে গেছি কিন্তু বাস্তবে তা নয়। মাঝখানে বাধা আছে, কাচের বোতলটা রয়েছে। প্রাকৃত বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরমার্থ জগতের অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ অসম্ভব। 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর'।

কেবলমাত্র বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, আন্তরিক সমর্পণ বা আত্মনিবেদনের দ্বারাই সেই জগতে প্রবেশের জন্য ভিসা বা প্রবেশপত্র পাওয়া যায়, তা আবার সে জগতের ব্যক্তিই কৃপা করে দেবেন, তবে সেই চিৎধামের মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব।

সুতরাং সেই চিন্ময় ধামে যাওয়ার জন্য শিষ্যের পক্ষে এই তিনটি যোগ্যতা থাকা দরকার — Humility, Sincerity and dedication সঙ্গত বিনয়, আন্তরিকতা বা নিষ্ঠা ও আত্মনিবেদন; এই তিনটির দ্বারা গুরুদেবের কৃপা পাওয়া যায় এবং সেই কৃপার ফলে গোলোক বা চিৎজগতে প্রবেশের অধিকার হয়। এই সব কথা বেদ, উপনিষদ্ ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে বলা হয়েছে, উপনিষদ বলেন,—

"তদ্‌বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"— "গুরুদেবের কাছে যাও, মনে কোন দ্বিধা নিয়ে নয়, কেবল ঐকান্তিক আগ্রহ ও সরল হৃদয় নিয়ে যাও।"

পরমার্থপথের যাত্রা — কেবল যাওয়ার টিকেট্

রিটার্ণ টিকেট কেটে গুরুর কাছে যাওয়া যায় না। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রায়ই বলতেন "তোমরা ত' রিটার্ণ টিকেট্ কেটে এসেছ।" এই মনোভাব অর্থাৎ পূর্ব থেকেই ফিরে আসার পাকা বন্দোবস্ত করে গুরুর কাছে যাওয়া যায় না। আমাদের ভেবে নেওয়া দরকার যে, আমরা এজগতের যা কিছু জেনেছি, পেয়েছি, তার প্রকৃত স্বরূপটা যে কি, তা জানা হল, এখান থেকে আর কিছু পাওয়ার নাই, যা হয়েছে, তা যথেষ্ট, এই

বিচার নিয়ে গুরুদেবের কাছে যাওয়া চাই। জগতে বেঁচে থাকতে হলে তার এই একটি মাত্র উপায়।

এই জগৎটা মরণশীল, এখানে বেঁচে থাকার মতো অন্য কোন উপায় নেই। অথচ বাঁচার জন্য সকলের মধ্যেই একটা প্রবল ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি আছে, "আমি বাঁচতে চাই ও নিজেকে রক্ষা করতে চাই, সেই জন্য আমি প্রকৃত আশ্রয় দাতার কাছে ছুটে যাচ্ছি"— এই প্রকার আগ্রহ নিয়ে শিষ্য গুরুর কাছে যাবে এবং গুরুর সেবার জন্য তার মধ্যে যা রয়েছে সে সব নিয়েই সে গুরুকে আশ্রয় করবে। এমন নয় যে, সে গুরুর শিষ্য হয়ে তাঁকে দয়া করছে বা গুরুর নাম-যশ বাড়াবার জন্য সে শিষ্যত্ব স্বীকার করেছে।

এতো গেল শিষ্যের কথা। এখন গুরুর আসন কেমন তা জানা দরকার। গুরুর মধ্যে কেবল শাস্ত্রে জ্ঞান থাকলে হবেনা। তাকে শাস্ত্র বাক্যে নিষ্ণাত হতে হবে অর্থাৎ শাস্ত্রের বাক্য তাঁর অনুভূতির মধ্যে আসা চাই। পৃথিবীতে কত লোক শাস্ত্রের কতরকম বাখ্যাই না করছে। শ্রীগুরু সেই সব শাস্ত্রজ্ঞান তার আচরণের মাধ্যমে জগতে বিস্তার করবেন অর্থাৎ তার সমগ্র জীবন যাপন প্রণালীটাই শাস্ত্রবচন রূপে প্রকাশ পাবে। তার যাবতীয় কর্ম জগতের সঙ্গে নয়, তা পরমব্রহ্মের সঙ্গে, যে পরমব্রহ্ম এই সমগ্র সৃষ্টিকে ধরে রেখেছে, যে পরমব্রহ্ম সমস্ত সৃষ্টির মূলাধার, সেই ব্রহ্মতে গুরু পরিনিষ্ঠিত হয়েছেন— ব্রহ্মনিষ্ঠম্ গুরুর জীবনটা অন্য যে কোন জড় জগতের প্রাণ বা মানুষের মতো নয়। তিনি এই জড় জগতে থেকেও অপ্রাকৃত জগতের সঙ্গে সর্বদা যোগযুক্ত। তিনি যা কিছুই করেন, সেই চিন্ময় চেতনার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েই করে থাকেন। এইটিই হলো উপনিষদের অন্তরনিহিত অর্থ। আর শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হয়েছে,—

> তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
> শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

মায়ার অর্থ বিভ্রান্তি আমরা সকলেই এই ভ্রান্তির মধ্যেই বাস করছি। পরতত্ত্বের সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নাই। যা আছে, সে সবই উল্টো, কেবল অপস্বার্থপরতা আর বিভ্রান্তির দ্বারা আমাদের মন-বুদ্ধি আচ্ছন্ন। যখন আমরা অনুভব করি,— আমাদের চারদিকে যা কিছু দেখছি, সে সবই ক্ষণস্থায়ী, একদিন সবই শূন্য হয়ে যাবে, তখনই আমরা পরমার্থপথের দিগ্‌দর্শক শ্রীগুরুদেবের কাছে যাওয়ার জন্য উদ্‌বিঘ্ন হই। তখনই প্রশ্ন আসে — "আমার সবচেয়ে ভাল কিসে হবে?" এই প্রকার জিজ্ঞাসা নিয়েই সদ্‌গুরুর কাছে যেতে হয়।

কি প্রকার গুরুর কাছে যাব? যিনি কেবল শাস্ত্রজ্ঞানে পারদর্শী নন, অধিকন্তু তাঁর

পরতত্ত্বের অনুভূতি আছে। তাঁর মধ্যে পরতত্ত্বের প্রকাশ হয়েছে, শাস্ত্রের মর্ম কি তা যিনি জানেন, আবার তাঁর জীবনে, তাঁর আচরণে শাস্ত্রবাণী মূর্ত্তবিগ্রহ ধারণ করেছে, যিনি কৃষ্ণচেতনায় নিষ্ণাত, তিনিই যথার্থ গুরু। সুতরাং প্রকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ কি, তা কি করে লাভ করা যায়, তার জন্য সেই প্রকার গুরুকেই আশ্রয় করতে হবে, তা না হলে আমরা ভুল পথে চলে যেতে পারি। তাতে যখন কোন ফল পাই না, তখন মনে করি - "এখানে কিছুই নাই, এ ঠিক নয়।" তাই প্রকৃত পন্থা আশ্রয় করে সাধন করলে আমরা পরতত্ত্বের বাস্তব স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারব।

অধ্যায়-২

অপ্রাকৃত বিজ্ঞানের দীক্ষা

দীক্ষার অর্থ কি? শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে দীক্ষার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করেছেন।

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ
কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা
দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥

অভিজ্ঞ তত্ত্বদর্শী গুরুবর্গ 'দীক্ষা'র অর্থ এই প্রকার করেছেন, — গুরু যে পন্থাদ্বারা শিষ্যের মধ্যে অপ্রাকৃত জ্ঞান সঞ্চার করেন, তার নামই দীক্ষা। তার দ্বারা শিষ্যের পূর্বার্জিত যাবতীয় পাপ ধ্বংস হয়। দীক্ষার মাধ্যমে শিষ্যের চিত্তশুদ্ধি হয় এবং সে ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়ার মত নূতন জীবন লাভ করে। দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য দীক্ষাই হচ্ছে অন্তরের জাগরণ। সেই দিব্যজ্ঞান ত' আমাদের অন্তরেই রয়েছে, তবে তা সুপ্ত ছিল; দীক্ষার দ্বারা তার প্রকাশ হওয়াতে শিষ্যের হৃদয়ের সম্পদ আবিষ্কৃত হয় এবং সে বাহিরের সমস্ত দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়।

হৃদয়ের দিব্য জ্ঞানের আবির্ভাবের ফলে পূর্বের যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়। যেমন আমরা বাইরে থাকাকালে থাকবার জন্য যে সব বন্দোবস্ত, আয়োজন করে থাকি, ঘরে এলে সে সবের সম্পর্ক আর থাকে না। কারণ ঘরেই ত' সে সব ব্যবস্থা রয়েছে। বিদেশে থাকাকালে আমরা হোটেলে থাকি, আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা সেখানে থাকে, কিন্তু যখন ঘরে এসে পৌঁছাই, তখন আর সে সব আবশ্যক হয় না। সেই ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে সম্পর্ক কেটে যায়; আর সে সব ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। এমন ত' দেখা যায়, কোন শিশুকে কেউ তার ঘর থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে বড় হয়ে হয়ত' নিজের বাড়ীর কাছে কোন হোটেলে বাসা নিল। হঠাৎ সে জানতে পারল যে, তার বাড়ী কাছেই আছে এবং সেখানে তার বাবা-মা রয়েছেন। তখন সে বাড়ী ফিরে এলে তার বাবা ত' তাকে চিনতে পেরে বলবেন, "বাছা! তুমি যখন ছোট ছিলে, তখন তুমি ঘরছাড়া

হয়ে এতদিন অজ্ঞাতবাস করেছ, এই তোমার নিজের ঘর, আমরাই তোমার নিজের লোক। আমি তোমার বাবা, ইনি তোমার মা, এরা তোমার ভাই-বোনেরা।" এর পরে তখন তার আর হোটেল ও সেখানকার ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন হয় না।

এই রকম আত্মার যখন স্বরূপ উপলব্ধি হয়, তখন তার এই জন্ম বা পূর্বজন্মের যে সব পাপ-পুণ্যের সম্পর্ক বা দায়-দায়িত্ব, সে সবই ছিন্ন হয়ে যায়। সে তখন নিজের আত্ম-স্বরূপের ঘরে— ভগবানের পাদপদ্মে ফিরে যায়। তাই ক্ষণস্থায়ী অনিত্য জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মার নিত্য নিবাস ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়ার নামই "দীক্ষা"।

মন্ত্র ও উপদেশ

দীক্ষা ও শিক্ষা অর্থাৎ মন্ত্র ও পারমার্থিক উপদেশ — এই দুইএর পার্থক্য জানা চাই। 'দীক্ষা'র অর্থ মন্ত্র গ্রহণ — ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অনুমতিপত্র। তাকে কার্যকরী করতে গেলে আনুষঙ্গিক কতক ব্যবস্থা, পরামর্শ, নির্দ্দেশগুলিকে পালন করতে হয়। ঐ গুলি তার সহায়ক পরিপূরক — শিক্ষা দীক্ষারই অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ। দীক্ষাতে 'সাধারণ পন্থা' দেওয়া হল, এখন তাকে কার্য্যে পরিণত করবার জন্য কতকগুলি সহায়ক অনুকূল বিধি-নির্দ্দেশ মেনে চলতে হয়। সেই গুলি কি, তা শ্রীমদ্‌ভাগবতেই বলা হয়েছে, —

> শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
> অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
> ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
>
> ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪

কৃষ্ণকথা-শ্রবণ, কৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা কীর্ত্তন ও স্মরণ, কৃষ্ণের পাদপদ্মসেবা, কৃষ্ণবিগ্রহের অর্চ্চন, কৃষ্ণচরণে প্রার্থনা, কৃষ্ণের দাস্য, সখ্য এবং কৃষ্ণচরণে সর্বাত্মনিবেদন ভক্তির এই নয়টি মুখ্য অঙ্গ। এই উপদেশের সঙ্গে আরও অনেক উপদেশ, নবধা ভক্তির পরিপোষক অঙ্গ প্রয়োজন হয়।

দীক্ষা — পারমার্থিক অভিযান

যখন কোনও সেনাপতি অন্য দেশকে আক্রমণ করার যোজনা করে, তখন তাকে তার পূর্বে আক্রমণ করার মোটামুটি একটা কৌশল ও খসড়া প্রস্তুত করতে হয়। যখন সে সেই খসড়াকে বাস্তবে কার্য্যে পরিণত করতে আরম্ভ করে, তখন কত রকম বাধাবিপত্তি দেখা দিতে থাকে, সে সেই বাধা গুলির নিরাকরণ করে, সমাধান করে এবং

এগোতে থাকে। যখন কোন ব্যক্তি ভ্রমণ করতে বেরোয়, তখন প্রথমে সে তার একটা সংক্ষিপ্ত যোজনা প্রস্তুত করে — "আমি এই দেশ থেকে এই এই দেশে এই এই পথে যাব, আবার ঐঐ পথ দিয়ে ঐঐ দেশ দিয়ে ফিরব" ইত্যাদি। এর পর আরও কত কি টুকি-টাকি ছোট-খাটো ব্যবস্থা আছে, তার সমাধান করে। প্রথমে সে ট্যাক্সি ভাড়া করে এরোড্রামে যায়, নির্দ্দিষ্ট প্লেনের টিকেট কাটে, — এই রকম কত কি। তাই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে আমরা পরমার্থরাজ্যের কথা কিছুটা অনুমান করি। এই রকম সামগ্রিক জ্ঞানই শিক্ষা।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, যদি কোন সাধক পুরোপুরি মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয় নাই, অথচ তাকে মন্ত্র-দীক্ষা দিয়ে শিষ্য গ্রহণ করতে হয়, এই রকম অবস্থাতে কি করা উচিত?

এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, যখন কোন ছোটখাটো ব্যবসায়ী সামান্য পুঁজি নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করে, তখন সে কোনও ধনী মহাজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে সম্পর্ক পাতায় যাতে আবশ্যক সময়ে সে অধিক পুঁজি পেতে পারে। এই ভাবেই সে ব্যবসায়ে উন্নতি করে। এই রূপ যখন কোন সাধক কৃষ্ণ চেতনায় সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নাই, তখন সে কোনও সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ নিজের চেয়ে উন্নত সাধকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। তবেই সে প্রয়োজন মুহূর্ত্তে তাঁর উপদেশ নিয়ে কাজ করবে। তা হলেই সে সাধক নিরাপদে সাধনায় এগোবে এবং অন্য শিষ্যকেও এগোতে সাহায্য করতে পারবে। আমরা যদি মায়ার সঙ্গে, অবিদ্যার সঙ্গে, সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হই, তবে আমাদের চেয়ে উন্নত স্তরের সাহায্য নিতেই হবে।

মায়াকে জয় করা ত' খুবই কঠিন, তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতায় বলছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দূরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

গীতা ৭।১৪

"আমার মায়াকে জয় করা খুবই কষ্টকর। কেবল যারা আমার শরণাগত হয়, তারাই আমার ঐ মায়াকে অতিক্রম করতে পারে।" মায়া কেবল কৃষ্ণকেই ভয় করে। কারণ, মায়া কৃষ্ণের কাছ থেকেই যা কিছু শক্তি পেয়েছে। যদি কেউ একাকী মায়াকে জয় করতে সাহস করে, তবে তাতে সে অসমর্থ হবে। যদি আমাদের কোন উন্নতস্তরের সাধুর সঙ্গ হয়, তাঁর সাহায্যেই আমরা মায়াকে জয় করতে পারি। মায়া যখন দেখবে যে, আমরা তার চেয়ে শক্তিশালী সাধু-গুরুর সম্পর্কে এসেছি, তখন সে আপনাহতেই সরে দাঁড়াবে।

আমাদিগকে সর্বদাই মায়ার অতীত সাধু, গুরু, শাস্ত্র — এঁদের আশ্রয়ে থাকতেই হবে। তাঁদের মাধ্যমে সাহায্য ও বল উপর থেকেই আসে, আর আমরা সেই কৃপাবলকে সমগ্র হৃদয় দিয়ে ধরে রাখব।

শিষ্য গ্রহণ ও কর্ম

যারা শিষ্য গ্রহণ করে, এমন দেখা যায় যে, শিষ্যের কর্মফলের কিছুটা গুরুকেই ভোগ করতে হয়, এমন প্রসঙ্গও মাঝে মাঝে শোনা যায়। এর উত্তর হচ্ছে, শারীরিক কষ্টের কথা মনে আনা ঠিক নয়, বা স্থূল ও বাহ্য সফলতাও গুরুত্বের মানদন্ড নয়। হাজার হাজার শিষ্য থাকলেই যে একজন বড় সাধু, এও নয়।

একজন সৎসাধক কিছু লোকের পারমার্থিক জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু লক্ষ্য করলেন যে তাদের তেমন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। তার ফলে হয়ত' তিনি কিছু বাহ্য ক্লেশ অনুভব করে থাকেন, তিনি হয়ত' চিন্তা করেন, "এই শিষ্যগণের পারমার্থিক জীবনের দায়িত্ব আমি নিয়েছি, কিন্তু তাঁদের জীবনে পারমার্থিক উন্নতি সাধনে ততটা সাহায্য দিতে সক্ষম হতে পারছি না।" এটা কিন্তু খারাপ নয়, ভাল লক্ষণই। বৈষ্ণবদের নিজের জন্য কোন কষ্ট নাই, কিন্তু কষ্ট যা পান, ত' অন্যের জন্য, — "পরদুঃখদুঃখী"। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রার্থনাতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী সম্পর্কে লিখেছেন, — শ্রীল সনাতন গোস্বামী সবসময়ই অপরের দুঃখ দেখে দুঃখী হতেন। বৈষ্ণবের নিজের জন্য কোন মানসিক দুঃখও নাই। কিন্তু অপরের মানসিক দুঃখ দেখে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। বৈষ্ণব নিজের দুঃখ, অপমান ক্ষতি ইত্যাদির বেলায় বৃক্ষের মত সহিষ্ণু, কিন্তু তিনি পরদুঃখ-কাতর, পরের দুঃখ সহ্য করতে পারেন না। পরের দুঃখে তাঁরা সমদুঃখদুঃখী। ইহাই মধ্যমাধিকারী ভক্তের লক্ষণ।

এই মধ্যমাধিকারী ভক্তকে শিষ্যের মন্দ ও অনিশ্চিত কর্মের বা কদাচারের কিছু অংশ হজম করে নিতে হয়, তিনি উপদেশ দিয়ে তাঁদের শোধন করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে থাকেন।

যখন কোন ডাক্তার কোন রোগীর চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং রোগীর কষ্ট হয়, তখন সেই ডাক্তার হয়ত' মনে মনে দুঃখ পেয়ে চিন্তা করেন "আমি এই রোগীর যন্ত্রণা উপশমের ও রোগ সারাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, কিন্তু তার দুঃখ ও রোগ সারাতে পারছি না।" এই ভাবে তিনি অপরের কষ্টের কিছুটা অংশ নিজের উপর নিয়ে থাকেন।

সেই রকম পারমার্থিক পথপ্রদর্শক গুরুও ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রণা

অনুভব করে থাকেন, কোন সময় হয়ত কোন গুরু নিজের ভিতর অনুভব করেন, "আমি ত' যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, কিন্তু, শিষ্যের কিছুই উন্নতি দেখতে পাচ্ছি না।"

এই স্তরের গুরু বাস্তবিকই শিষ্যের বিশেষ কোন দায়িত্ব নির্বাহ করতে সমর্থ নন। তিনি হয় এও চিন্তা করতে পারেন, "আমি ত' যথাসাধ্য আমার কর্ত্তব্য করেছি" এবং খোলা হৃদয়ে শিষ্যকে তা জানিয়ে দিতেও পারেন। এই প্রকার গুরু Consulting Physician and Family Doctor পরামর্শদাতা ও গৃহ-চিকিৎসকের মত। তিনি তাঁর দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন না। কিন্তু বাইরের ডেকে আনা ডাক্তার যখন দেখেন রোগ সারছে না, তখন তিনি "অন্য ডাক্তার দেখান" বলে দায়িত্ব এড়াতে পারেন। কিন্তু গৃহ চিকিৎসক তা ঝেড়ে ফেলতে পারেন না। তিনি এও চিন্তা করেন — "আমি ত' যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, কিন্তু আরোগ্য লাভ ত' সম্পূর্ণ কৃষ্ণকৃপার অধীন"।

মধ্যমাধিকারী গুরুর শিষ্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক এই গৃহ-চিকিৎসকের মতই। এই স্তরের গুরু শিষ্যের দায়িত্ব কতটা বা কোন স্তর পর্য্যন্ত নেবেন, তা নির্ভর করে তাঁর ব্যক্তিগত সামর্থ্য এবং শিষ্যের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের গভীরতা বা নিবিড়তা ইত্যাদি ব্যক্তিগত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বিচার আবশ্যক।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, শিষ্যের পারমার্থিক উন্নতি তার নিজের প্রচেষ্টা ও গুরুকৃপা এ দুইয়ের মধ্যে কোনটির উপর বেশী নির্ভর করে? গুরুর উপদেশের দ্বারা শিষ্য কিভাবে বাস্তব উন্নতি করতে পারে?

এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তা শিষ্যের ক্রমানুভূতির স্তরের উপর নির্ভর করে। গুরুর প্রতি শিষ্যের একান্ত ভক্তির উপরই সব নির্ভর করে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে,—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

গুরু ও কৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তিই ভক্তিমার্গে সফলতার একমাত্র চাবিকাঠি। গুরু-কৃষ্ণ প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসের দ্বারাই শাস্ত্রের মর্ম শিষ্যের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। গুরু হলেন কৃষ্ণের প্রতিনিধি। আমরা কৃষ্ণানুসন্ধানের প্রয়াসী, তাই যেখানেই আমরা কৃষ্ণ-সম্বন্ধের বাস্তব সন্ধান পাই, সেইখানেই আমরা আমাদের সমগ্র সত্তা দিয়ে তার প্রতি একনিষ্ঠ হওয়ার জন্য প্রযত্ন করব। সফলতার এইটিই মুখ্য হেতু। কৃষ্ণ পূর্ণ-চৈতন্য, আমাদের তাঁর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি সাধনার ফল কৃষ্ণ থেকে আমাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হবে। কৃষ্ণ সর্ব্বব্যাপী। সেই অনন্তের প্রতি বিন্দুই সর্ব্বব্যাপী, প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বত্রই সেই

কেন্দ্রবিন্দুকেই দর্শন করেছিলেন। হিরণ্যকশিপু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—

"তোর হরি যদি সর্ব্বত্র আছেন তবে এই স্তম্ভেও নিশ্চয় আছেন?"

উত্তরে প্রহ্লাদ বললেন, "হাঁ নিশ্চয়ই আছেন"।

হিরণ্যকশিপু যখন স্তম্ভটাকে ভেঙ্গে দিলেন, তখনই নৃসিংহদেব আবির্ভূত হলেন।

গুরু — স্বতন্ত্র না পরতন্ত্র

শ্রীগুরুদেবের এই স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্রস্বরূপ একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। কৃষ্ণের বিশেষ ইচ্ছায়ই গুরু আদিষ্ট শক্তিতত্ত্ব। কৃষ্ণ গুরুর ভিতর নিজের শক্তি সঞ্চার করেছেন। একান্ত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা যাবে, গুরু কৃষ্ণের অবতার — শক্ত্যাবেশ অবতার এবং এই দৃষ্টিতেই তাঁকে দেখতে হবে। আবার গুরু কৃষ্ণভক্ত এবং কৃষ্ণের প্রকাশ তাঁর মধ্যে ইহাও যুগপৎ বিদ্যমান। গুরুদেবের এই দুই প্রকার স্বরূপ। একদিকে তিনি বৈষ্ণব, আর কৃষ্ণের প্রকাশ। বৈষ্ণবই গুরু। একাদশীর উপবাসে গুরু শস্য প্রসাদ গ্রহণ করেন না। তখন তিনি বৈষ্ণব। কিন্তু গুরুর বিগ্রহ যখন সিংহাসনে পূজিত হন, তখন শিষ্য তাঁকে শস্য-নৈবেদ্য অর্পণ করেন। উপবাস তিথিতেও গুরুদেবের শ্রীবিগ্রহকে শস্য-নৈবেদ্য অর্পণ করা শাস্ত্র-সম্মত।

শিষ্য গুরুর আন্তঃস্বরূপ অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রকাশ বিগ্রহরূপে দর্শন করেন এবং এই স্বরূপের সঙ্গেই শিষ্যের সম্বন্ধ। কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহই আচার্য্য বা গুরু। শিষ্য গুরুদেবের মধ্যে কেবল এই বিশেষ, স্ফূর্ত্ত সত্তাই প্রত্যক্ষ করেন। এই বিচারে গুরুদেবের এই বিশেষ স্বতন্ত্র স্বরূপের সঙ্গেই শিষ্যের সম্বন্ধ। কিন্তু গুরুদেব নিজেকে সাধারণতঃ বৈষ্ণব বলেই প্রদর্শন করেন। তাই নিজের শিষ্যের সঙ্গে এবং অন্যান্য বৈষ্ণবের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই বিচারকেই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ — Inconceivable Unity in Diversity.

ক্ষেত্রবিশেষে অনুকরণ আবার কোনক্ষেত্রে বিচ্যুতি, দুইটিই সম্ভব। অন্যাভিলাষ বা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য কোনও ব্যক্তি গুরুগিরিকে একটা ব্যবসা বলে ধরে নিতে পারে, যেমন বেশীর ভাগ জাত-গোসাঁইরা এবং অনুকরণকারী সহজিয়ারা আজকাল করে বেড়াচ্ছে। যে কোন উদ্দেশ্যেই হোক যে কোন ব্যক্তি গুরুর অভিনয় করতে পারে কিন্তু প্রকৃত গুরুর লক্ষণ আমাদের শাস্ত্রেই প্রদত্ত হয়েছে—

"শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্" ॥

ভাঃ ১১।৩।২১

"প্রকৃত সদ্‌গুরু বৈদিক শাস্ত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি শাস্ত্রের মর্ম সম্পর্কে যথার্থ অভিজ্ঞান লাভ করবেন, পরতত্ত্বের অনুভূতি বা বিজ্ঞান লাভ করবেন, পরতত্ত্বের অনুভূতি বা বিজ্ঞানের অধিকারী হবেন এবং তাঁর আচরণে কাম-ক্রোধাদি রিপুসমূহের বহিঃপ্রকাশ থাকবে না।"

শাস্ত্র সাধু-সাপেক্ষ

শাস্ত্র বুঝাতে সাধুর প্রয়োজন হয়। যে কোন ব্যক্তি বলতে পারে — "আমিই হচ্ছি প্রকৃত গুরু, আর কেউ নয়।" অনুকরণ সব বেলাতেই সম্ভব। প্রকৃত গুরুর লক্ষণ শাস্ত্রই নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন। প্রকৃত গুরুই শাস্ত্রের মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে পারেন। গুরু ও শাস্ত্র পরস্পর নির্ভরশীল। স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য একটি অপরের উপর নির্ভরশীল, শাস্ত্রই বলেন, আমাদের কোন অভিজ্ঞ শাস্ত্রবিদ্ বা বৈষ্ণবগুরুর নিয়ামকত্বে শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত (আচার্যবান্ পুরুষো বেদ)। সুতরাং শাস্ত্র সদ্‌গুরুর উপর নির্ভর করেন। এখন প্রকৃত সদ্‌গুরু কে, তাও শাস্ত্রই নির্দ্দেশ করে থাকেন। এই শাস্ত্র ও সদ্‌গুরু পরস্পর নির্ভরশীল। তাই সাধু ও শাস্ত্র, এ দুইয়ের প্রয়োজন আছে। তারা active and passive agents, অর্থাৎ কৃষ্ণের, সাধু প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্র পরোক্ষ প্রতিনিধি।

কৃষ্ণ কেন এত ভিন্ন ভিন্ন গুরুরূপে আবির্ভূত হন। কৃষ্ণ কেনই বা বার বার অবতীর্ণ হন? কেবল ভগবদ্‌গীতা পাঠ করেই কি সব জানা যায় না। বার বার আবির্ভাবেরই বা কি প্রয়োজন আছে? আমরা এখন যে সব তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন মনে করি সে সবই কি প্রাচীন শাস্ত্রে নাই?— এই প্রকার কত প্রশ্ন সাধক শিষ্যের মনে জাগ্রত হতে পারে, হয়েও থাকে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে কৃষ্ণ বলেছেন, আমিই এই বেদবিদ্যা প্রথমে ব্রহ্মার মাধ্যমে জগতে প্রকট করেছি। তার পরে তিনিও তাঁর শিষ্যবর্গ চতুঃসন, মরীচি এবং অঙ্গিরাদি পরম্পরার মাধ্যমে জগতে প্রসারিত হয়েছে। বিদ্যা প্রথমে এই সব ঋষিবৃন্দের হৃদয়ে সুরক্ষিত হয়েছিল, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভ করেছে।

প্রথমে এই বিদ্যা শব্দের আকারে প্রকট হয়েছিল, অক্ষরাকারে নয়। ক্রমশঃ তা লিখিত গ্রন্থে সুরক্ষিত হল। সৃষ্টির আদিতে তা প্রত্যক্ষভাবে শব্দাকারে এক ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য ব্যক্তির মধ্যে মুখ থেকে কানের ভিতর দিয়ে অবতীর্ণ হল। সে সময় অক্ষর বা লিপি উদ্‌ভাবিত হয় নাই; কিন্তু শব্দের আকারেই জ্ঞান-বিদ্যা সম্পাদিত ছিল। একজনের মুখ থেকে আর একজনের কানে, অর্থাৎ এই রীতিতে অতিক্রমণের ফলে

আসল বিদ্যা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পরম্পরাগত মাধ্যমের সংস্পর্শে এসে তা কখন লুপ্ত, কখন বিকৃত, কখন খণ্ডিত হয়ে গেলে ভগবান্ তখন অবতার গ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভব করেন (যদা যদা হি ধর্মস্য)।

কখনও কৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হন; কখনও বা তাঁর কোন পার্ষদকে ধর্ম সংস্থাপনার জন্য প্রেরণ করেন।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, — "হে অর্জুন! এই যে কর্মযোগের কথা তোমাকে বললাম, তা আমি পূর্বে সূর্য্যকে বলেছি; তার পর সূর্য্য থেকে বংশানুক্রমে তা প্রচারিত হয়েছে। তাই তা এত খণ্ডিত ও বিকৃত হয়ে গিয়েছে। পুনশ্চ এখন আমি তাই তোমাকে আজ বল্ছি"। দূষিত দুর্বল স্তর ক্রমশ সত্যকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলে। প্রথম আবির্ভাবের সময় সত্য খুবই উজ্জ্বল, কিন্তু এই দুর্বল স্তরের মাধ্যমে অবতরণ করার সময় নীচসংসর্গে এসে ক্রমশঃ তা দুর্বল, খণ্ডিত, বিকৃত ও নীতিভ্রষ্ট রূপে প্রতীত হয়, সত্যের বাস্তব স্বরূপ লুক্কায়িত হয়ে যায়। তখন কৃষ্ণ সেই স্বরূপকে বলশালী করার জন্য বার বার অবতীর্ণ হন এবং নবযুগের প্রবর্ত্তন করেন।

গুরুর বাজার

বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করে অনেকে গুরু সেজে সরল অজ্ঞ লোককে প্রতারিত করেন দেখা যাচ্ছে। এখন প্রকৃত গুরু কে, প্রতারক কে, আমরা প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করছি না শঠ-গুরুর পাল্লায় পড়েছি, তা কি করে বুঝতে পারব, এ রকম প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক। এর উত্তরে বলা যেতে পারে, আমাদের অনুসন্ধান করা দরকার তাঁর মূল উৎসটা কি? আমরা যখন সোনার গয়নার জন্য কাঁচা সোনা কিনি, তখন এটা বুঝে নেওয়া দরকার সেই সোনা খাঁটি না সোনার রং দেওয়া? তা আবার জানা যাবে কোন খনি থেকে সোনা আনা হয়েছে। যখন জানব যে, তা মেকি নয় সোনার খনি থেকে আসা আসল সোনা, তখন আর চিন্তা নাই। তাই গুরুর পরম্পরা জানা দরকার।

গান্ধিজী যখন হাতে চরকায় কাটা সুতোয় তৈরী করা খাদির প্রচলন করতে আন্দোলন আরম্ভ করলেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কাপড় কেনা-বেচার লাভের পয়সা গরীবের পকেটে যাক। কিন্তু, যখন তিনি শুনলেন জাপান ও জার্মানীর পুঁজিপতিগণ নকল খাদি প্রস্তুত করে বাজারে ছাড়ছে, তখন তিনি খাদি-ব্যবসায়ের একটা সংঘ তৈরী করলেন এবং বললেন, এই সংঘের ও তার শাখা থেকে খাঁটি খাদিবস্ত্র ক্রয় করলে পয়সাটা দরিদ্র ব্যক্তির পকেটে যাবে।

একেই বলে গুরুপরম্পরা। পরম সত্য এই রকম সৎসম্প্রদায়ের পরম্পরানুগত গুরুপ্রণালীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়। তাই যখনই কোন গুরু বা কোন ধর্মগ্রন্থ দেখি, তখন দেখতে হবে, তার মূল উৎসটি কি? এই ভাবেই সদ্গুরু ও শঠ-গুরুকে চিন্তে পারা যায়। যাঁর প্রকৃত সাধুর সম্পর্ক আছে, তিনি নিশ্চয়ই সদ্গুরু।

আমি প্রায়ই হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউল এর উদাহরণ দিয়ে থাকি, গ্লোবিউলগুলোর কোন ঔষধি গুণ নাই, যতক্ষণ না মূল ঔষধি ওর সঙ্গে মেশান হয়।

কোন গুরু সেই একই মন্ত্র দিতে পারেন, কিন্তু তাতে কাজ হবে এমন কোন কথাই নাই। মন্ত্রের বা শব্দের শক্তিরই তারতম্য আছে। প্রকৃত সাধু সম্প্রদায়ের মন্ত্র তথাকথিত গুরু ব্যবসায়ীর দেওয়া মন্ত্র কখনই এক নয়। বটবৃক্ষের বীজ কত ছোট, কিন্তু তাতে এমন শক্তি নিহিত আছে, যা থেকে এক বিশাল বটবৃক্ষ হতে পারে।

তাই আমরা যখন গুরুচরণাশ্রয়ের প্রয়োজন অনুভব করব, তখন যথেষ্ট সতর্কতার সহিত যাচাই করে তবে মন্ত্রাদি গ্রহণ করা দরকার, তা না হলে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

অধ্যায়-৩

স্ফূর্ত্ত সত্যের অবতরণ

পতিতপাবনী গঙ্গার স্রোত যেমন পর্বতরাজ হিমালয়ের একটি শিখর থেকে অন্যশিখরে, একটা স্তর থেকে অন্য স্তরে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে নীচের দিকে নেমে আসে, ঠিক সেই রকম পরমার্থচেতনার সর্বশীর্ষ শ্রীকৃষ্ণচেতনা একটি স্তর থেকে আর একটি স্তরে অবতরণ করে আসে। কখন কখন গঙ্গার জলধারা সরস্বতী নদীর স্রোতের সঙ্গে মিশে যায়, তখন তাকে গঙ্গার জল বলা যাবে না। কিন্তু সরস্বতীর জল যখন গঙ্গাস্রোতের সঙ্গে মিশে যায় তখন সেই জলকেও গঙ্গাজল বলে। যখন দুই নদীই এক হয়ে বয়ে যেতে থাকে, তখন যে জল গঙ্গা থেকে বেরিয়ে অন্যত্র বয়ে যায় তখন কিন্তু সেই জলকে গঙ্গাজল বলে না। সরস্বতীর জল গঙ্গায় পড়ে প্রবাহিত হলে, তা গঙ্গাজলই হয়ে যায়, সেই জলই আমাদিগকে পবিত্র করে থাকে। কথায় বলে, গঙ্গানদীর গর্ভে যে জলই মিশুক না কেন, তা গঙ্গাজলই এবং তাই সকলকে পবিত্র করে, তার মূল উৎপত্তি যেখান থেকে হোক না কেন।

গঙ্গাজলে যে পবিত্র করার গুণ আছে, তা চোখে দেখা বা স্পর্শ করা জলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, স্থূলচোখে গঙ্গাজলের পবিত্রতা কি দেখা যায়? গঙ্গাস্রোতই যে পবিত্র, তার শাস্ত্র ও মহাজনের অনুমোদন আছে। এটা ত' জীবন্ত, প্রত্যক্ষ পবিত্র, তাই তা সকলকে পবিত্র করে জড় চোখে দেখা না গেলেও তাতে কি?

নিষ্ক্রিয় মন্ত্র

সদ্‌গুরু পরম্পরা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। সুতরাং যেখান থেকে হোক বা যাই হোক না কেন, অনুসন্ধান করতে হবে প্রকৃত গুরু কে? যার অপ্রাকৃত দিব্যচক্ষু আছে, ওই দিব্যচক্ষুর দ্বারাই সদ্‌গুরুর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। যিনি প্রকৃত ভগবদ্‌তত্ত্বজ্ঞ, অর্থাৎ কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, তিনিই প্রকৃত সদ্‌গুরু। তা না হলে কেবল দৈহিক বংশানুক্রমিক পরম্পরাই গুরুপরম্পরা নয়। তাই জাত ব্রাহ্মণ ও জাতগোসাঞিরা যে মন্ত্র পেয়ে থাকে, তাই দিয়েই গুরুগিরিকে একটা ব্যবসা করে ফেলেছে। এই প্রকার পাওয়া মন্ত্র নিষ্ক্রিয় বা নিষ্ফল।

আমরা কিন্তু জীবন্ত সক্রিয় মন্ত্রের অনুসন্ধান করছি। তার সন্ধান যেখানে পাই, তাই প্রকৃত গুরুর মন্ত্র এবং আমরা উন্নতস্তরের সাধনার জন্য ঐ প্রকার গুরু ও তাঁর কাছ থেকে পাওয়া মন্ত্রই আমরা গ্রহণ করব। এই প্রকার দিব্য দৃষ্টি যার হয়েছে, সেই প্রকৃত গুরু চিনতে পারে, তিনি যেখানে যে অবস্থায় থাকুন না কেন।

মন্ত্রদীক্ষার অর্থ হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তিভাবকে একজনের দ্বারা আর একজনের হৃদয়ে সঞ্চারিত করা এবং তা ঠিক ঠিক হওয়া চাই। বাহ্য অনুসন্ধান দ্বারা যেমন হোমিওপ্যাথিক বড়ির প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না; কিন্তু তাতে শক্তি থাকে। সেইরকম মন্ত্রের মাধ্যমে চেতনা ও ভাব সঞ্চারিত করা হয়।

নির্বিশেষবাদীরা সেই মন্ত্রই জপ করে এবং তারা সেই কৃষ্ণনামও কীর্ত্তন করে। কিন্তু সেই নাম ও মন্ত্র ব্রহ্মজ্যোতিতেই লীন হয়ে যায়। তারা বিরজা অর্থাৎ জড় জগৎ ও পরজগতের মাঝখানে যে সীমারেখা তা অতিক্রম করতে পারে না। যখন কোন মায়াবাদী কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করে, তখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন যে, তাদের উচ্চারিত কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের অঙ্গে বজ্রাঘাতের মত কাজ করে, তা কোন প্রকার চিত্তপ্রসাদন প্রভাব উৎপন্ন করতে পারে না। গৌড়ীয় সম্প্রদায় বাস্তববস্তুর সঙ্গে যোগাযোগ করে, তারা কেবল কাঠামোটার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে না। আমরা কিন্তু পারমার্থিক চিন্তারাজ্যের কোনটা কি তাই জানতে চাই। আমরা কেবল কাঠামোটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করি না, তার প্রতি আমাদের কোন আকর্ষণ বা মোহ নাই। পারমার্থিক বা ভক্তিচেতনাতে ক্রমপন্থায় অগ্রসর হওয়াই আমাদের চরম লক্ষ্য। শ্রীল রূপগোস্বামী তাঁর উপাদেশামৃতে বলেছেন,—

> "কর্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া
> ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন -
> স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমা
> প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।"

বহু জড়বাদীর মধ্যে একজন মাত্র দার্শনিক বা জ্ঞানী থাকেন, আবার তাদের অনেকের মধ্যে একজন জ্ঞানমুক্ত ভক্ত থাকতে পারেন, আবার অনেক ভক্তের মধ্যে একজন মাত্র প্রেমিকভক্ত থাকেন। এই প্রেমিক ভক্তই সর্বোত্তম।

আমরা এই প্রকার ক্রমিক স্তর সম্পর্কে জানবার জন্য প্রয়াসী। বিরজা কি, পারমার্থিক জগৎ কি, তার পরে শিবলোক, বৈকুণ্ঠধাম, তার পরে শ্রীরামের ধাম অযোধ্যা, তারপর দ্বারকেশ কৃষ্ণ, মথুরেশ কৃষ্ণ ও ব্রজের কৃষ্ণ সমগ্র চিৎজগতের এই উত্তরোত্তর উন্নত

স্তর সমূহের জ্ঞান ও ভক্তিচেতনা আমরা লাভ করতে চাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণ নিজেই এই ক্রমোন্নত স্তর দেখিয়ে দিয়েছেন, তিনি উদ্ধবকে বলেছেন,—

ন তথা মে প্রিয়তম
আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সংকর্ষণো ন শ্রী -
র্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥

ভা ১১।১৪।১৫

"ব্রহ্মা, শিব, সংকর্ষণ, বৈকুণ্ঠাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী এমন কি আমার নিজের স্বরূপও তোমা থেকে আমার অধিক প্রিয় নয়। তুমিই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম উদ্ধব।"

আমাদের এর অন্তর্নিহিত তত্ত্বের অনুসন্ধান করাই দরকার। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর শক্তি জাহ্নবাদেবী থেকে আরম্ভ করে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মন্ত্রদীক্ষা-গুরু শ্রীবিপিন গোস্বামী পর্যন্ত বহু নারী ও পুরুষ গুরু রয়েছেন। সেই গুরুপরম্পরা মাধ্যমেই মন্ত্র অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রীবিপিন গোস্বামী পর্য্যন্ত এবং তাঁর কাছ থেকে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মন্ত্র পেয়েছেন। আমরা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে গ্রহণ করেছি তার অর্থ এই নয় যে, আমরা এত নারী গুরুর সন্ধান করেছি বা তার দরকার আছে, তাও আমরা মনে করি না অথবা তাঁদের কি প্রকার সিদ্ধি ছিল, তাও জানার প্রয়োজন বোধ করি না।

আমরা পরম সত্যের দাসানুদাস। সেই সত্যের যে পবিত্র ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়ে আসছে, সেই স্বচ্ছ পবিত্র স্রোতের ভিখারী আমরা। কোন বাহ্যিক আকার বিশেষের জন্য লালায়িত নই; সেই অমৃতের ধারা যেখানেই পাব, সেইখানেই আমরা নতমস্তকে তার আশ্রয় গ্রহণ করব। যখন আমি নিশ্চিত হব যে সর্বোচ্চ ধাম থেকে সেই অদ্বয়তত্ত্বের, সেই রসামৃতের ধারা আমার কাছে এসে গিয়েছে, তখন আমি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করব।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে বলেছেন,—

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥

যেখানেই অপ্রাকৃত সত্যস্বরূপের, প্রেমভক্তিরসের আর্বিভাবের সন্ধান পাওয়া যাবে, সেখানেই আমি সর্বাত্মনিবেদন করে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করব; সে যে আকারেই আসুক। আকারের নিশ্চয় কিছু মূল্য আছে। তবে যেখানে কিছু দ্বিধা আসছে, সেখানে আকারের

চেয়ে তাঁর আত্মার আসল স্বরূপেরই মূল্য দিতে হবে। তা না হলে যেখানে আত্মা শূন্য, সেখানে কেবল বাহ্য আকারকে নিয়ে পড়লে তা সহজিয়ার শস্তা অনুকরণ মাত্র সার হবে।

আমরা যখন কৃষ্ণচেতনার বাস্তব স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হই, এবং সদ্গুরুর আশ্রয়ে যথার্থ পরমার্থ সম্পদের সন্ধান পাই, তখন অনুকরণ সর্বস্ব সহজিয়া ভাবধারা আমাদের হৃদয়ে প্রশ্রয় পেতে পারে না। আমরা যখনই অন্যত্র গুরুদেবের সাম্য ভাবধারার সন্ধান পাই, তখন ভাল করে দেখে নেওয়ার দরকার হয়, তা গুরুদেবের প্রকৃত চিত্তানুবৃত্তি কিনা। যার চেতনা জাগ্রত হয়েছে সেই দেখতে পারবে, "এখানেই ত আমার গুরুদেবের স্বর শুনতে পাচ্ছি, এঁর মধ্যেই ত' আমি আমার প্রিয় গুরুদেবকে দেখতে পাচ্ছি। এখন দেখছি কোনও ভাবে তা আমার কাছে এসে গিয়েছে, কেমন করে এল তা জানিনা। কিন্তু এর ভেতরই আমার গুরুদেবের বৈশিষ্ট্য, আচার-ব্যবহার ও স্বভাব দেখছি।" যখনই আমরা এই রকম বাস্তব সারবত্তা অনুভব করি তখন আর আমরা তাঁকে অবহেলা করতে পারি না।

এর একটি দৃষ্টান্ত পণ্ডিচেরীর অরবিন্দের জীবনে দেখতে পাই। তিনি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বঙ্গদেশে ব্রিটিশ শাসন-বিদ্রোহী দলের প্রথম ব্যক্তি বাংলায় বিপ্লবীদলের অধিনায়ক ছিলেন। ১৯২১ সালে তাঁর বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে একটা রাজদ্রোহের মকদ্দমা চলছিল। তখনকার একজন প্রখ্যাত এটর্নি মিঃ নর্টন অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে ঐ মকদ্দমা চালাচ্ছিলেন। তখন অরবিন্দ আত্মগোপন করেছিলেন। মকদ্দমার শুনানীর সময় তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না। মিঃ নর্টন তাঁকে খুঁজে বের করার জন্য খুব চিন্তিত ছিলেন।

অরবিন্দের ইংরাজী খুব ভাল ছিল, কারণ তাঁর বাল্যশিক্ষাকাল ইংলণ্ডেই কেটে ছিল। তিনি অন্য যে কোনও ইংরেজের চাইতে খুব ভাল ইংরাজী বলতে পারতেন। মিঃ নর্টন তখনকার সংবাদপত্র বা প্রকাশিত পুস্তকগুলি পড়তে সুরু করলেন। শেষে তিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় অরবিন্দের ইংরাজী লেখার শৈলী আবিষ্কার করলেন। "এইত অরবিন্দ।" লেখাটি পড়ার পর তিনি ধরে ফেললেন এবং অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদককে সমন পাঠালেন। মিঃ নর্টন সম্পাদককে জেরা করতে আরম্ভ করলেন।

"আপনি ত' এই পত্রিকার সম্পাদক। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এই লেখা কার।"

"— হ্যাঁ আমি জানি।"

"আপনি জানেন অরবিন্দ ঘোষ কে?"

"— হ্যাঁ আমি জানি এবং তিনি বর্ত্তমান পৃথিবীর একজন মহামানব।"

"সম্পাদক হিসাবে আপনি জানেন এটা কে লিখেছে?"

"— হ্যাঁ আমি জানি।"

"অরবিন্দ ঘোষ এই লেখা লিখেছেন কি?"

"— আমি বলব না।"

"এর শাস্তি আপনি জানেন?"

"— হ্যাঁ, ছয় মাস জেল।"

"আপনি তার জন্য প্রস্তুত কি?"

"— হ্যাঁ আমি প্রস্তুত আছি।"

মিঃ নর্টন কাগজটি হাতে নিয়ে বললেন,

"এখানেই মিঃ ঘোষ— আমার জেরা শেষ হল।"

মিঃ নর্টন লেখার মধ্যেই অরবিন্দকে দেখলেন। সেইভাবেই আমরা দেখতে পাব, এইখানেই ত' আমার গুরুদেব, আমার ইষ্টদেবতা।

আমাদের গুরুদেব (শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর) মাঝে মাঝে তাঁর একজন স্বধামপ্রাপ্ত শিষ্যের সম্পর্কে বলতেন,—

"ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমার কাছে এসেছিলেন, কিন্তু আমি চিনতে পারি নাই।" তাই যাঁদের দিব্যচক্ষু খুলে গিয়েছে তাঁরাই সর্বত্র স্বীয় ইষ্টদেবের দর্শন পান।

বহু গুরুর মধ্যে একই কৃষ্ণ

আমাদের গুরুদেবের চিত্তবৃত্তি ও চিন্তাধারা সম্পর্কে স্বচ্ছ দর্শন থাকা আবশ্যক। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলেন, —

"মাধবেন্দ্র পুরীর সম্বন্ধ ধর জানি।"

শ্রীমন্ মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রাকালে সনোড়িয়া বিপ্রের ভাবভক্তি লক্ষ্য করে তখনই ধরে ফেললেন যে, ঐ বিপ্র নিশ্চয়ই মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সম্বন্ধযুক্ত। তাই তাকে দেখে তিনি বলে উঠলেন, মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোথাও এইপ্রকার প্রেম ভক্তিরসের অভিব্যক্তি দেখা যেতে পারে না। এই ভাবধারা নিশ্চয়ই শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী থেকেই এসেছে। তাই আমাদের কৃষ্ণচেতনার বাস্তব পরিচয় জানা দরকার। শাস্ত্র বলেন—

"আচার্য্য মাং বিজানীয়াৎ", গুরু বা আচার্য্যকে ভগবান্ থেকে ভিন্ন মনে করা যাবে না।

সেই একই ধারাপরম্পরা মাধ্যমে নেমে আসছে, তাই এই অবিচ্ছিন্নতা ও একত্বকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। গুরু এখানেই থাকতে পারেন, আবার অন্যদেহে, অন্যত্রও থাকতে পারেন। সেই একই গুরু ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করে আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হন। তিনি সেই শাশ্বত সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করেন। তাই অন্তর্নিহিত আত্মাকে বাহ্যিক আকারের সঙ্গে সমান বলে মনে করা উচিত নয়।

কৃষ্ণচেতনার গভীরতাই লক্ষ্যের বিষয়। তা না হলে কেবল অনুকরণকারী সহজিয়া হয়ে যেতে হবে। সহজিয়া ভাবধারার অনুসরণকারীরা কেবল আত্মপ্রবঞ্চনাই করে থাকে; তারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবা করতে চায় না। তাই আমরা তাহাদিগকে মর্য্যাদা দিই না। বলতে গেলে, তারা মহাপ্রভুরই একপ্রকার বিরোধী। তারা যা তা বলে একটা সস্তা ব্যবসা করতে চায়। তারা সস্তায় ভেজাল জিনিসই বাজারে চালিয়ে দিতে চায়। তাদের পবিত্র নৈতিক ভক্তির জন্য কোন আগ্রহই নাই। এখন প্রকৃত পবিত্র ভক্তিভাবনা কি তা আমাদের গুরুদেবের অজানা ছিল না। তিনি রাগমার্গের কত উচ্চস্তরের সিদ্ধপুরুষ তা সাধারণ সাধক ধারণাই করতে পারে না। অথচ তিনি সর্বদাই দৈন্য করে বলতেন, "আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস" এইটিই তাঁর অন্তরের কথা। তিনি আরও বলতেন, 'উন্নত স্তরের ভক্তগণ আমার গুরু'।

প্রথমে এসে এ সমস্ত কথা জানা দরকার। তারপরেই লক্ষ্যে পৌঁছাবার আশা করা যেতে পারে। এটা এত সহজ বা সস্তা নয়। অসংখ্য মুক্তগণের মধ্যে ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্ত একজন পাওয়া খুবই শক্ত।

"কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।" কৃষ্ণচেতনা ত' অন্তরের জিনিষ। তাই যারা অন্তর দিয়ে সত্যের সন্ধান করেনা তারা বাহিরের খোলসটাকে নিয়ে টানাটানি করে। আমরা তা কখনই সমর্থন করি না।

আমরা বাস্তব সত্যেরই সাধক। ঐ সব বাহ্য আকার পূজকরা আমাদের স্পর্শই করতে পারে না। তাদের প্রচারের বাড়াবাড়িটা খুবই বেশী হতে পারে। কিন্তু তাতে আসল জিনিষ পাওয়া যায় না। আমরা ঐ প্রকার বাহ্যিক আচার বিচারকে গুরুত্ব না দিয়ে আন্তরিক সাধনাকেই অনুসরণ করব। প্রকৃত পবিত্র সাধনা কি প্রকৃত প্রেমভক্তিই বা কি যার জন্য ব্রহ্মা, শিবও সাধনা করেন, আমরা সেই প্রেম সেবারই পিয়াসী।

অধ্যায়-৪

আদিগুরু

আদিগুরু হচ্ছেন শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু। তিনিই গুরুরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশিত। মধুর রস ব্যতীত প্রথম চারিটি রসের গুরুতত্ত্ব হচ্ছেন তিনি। মধুররসে তিনি শ্রীরাধারাণীর অনুজা অনঙ্গমঞ্জরী।

শ্রীবলরামের চেয়ে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর স্থান উপরে। কেন না তিনি প্রেমভক্তি বিতরণ করেন। প্রেম কি? সকলপ্রকার প্রাপ্তির চেয়ে প্রেমের আসন উপরে। যদি কেউ প্রেম বিতরণ করতে পারে, তার আসন ত' সকলের উপরে, আর সবই তার নীচে। মহাপ্রভু যদি কৃষ্ণের চেয়ে বেশী, তবে নিত্যানন্দ প্রভুও বলরামের চেয়ে বেশী। বলরাম ও নিত্যানন্দ একই তত্ত্ব হলেও ঔদার্য্যযুক্ত বলরামই নিত্যানন্দ। বলরাম যখন প্রেমদাতা রূপে অবতরণ করেন, তখন তিনি নিত্যানন্দ।

আমাদের ভিত্তিটা খুবই দৃঢ় হওয়া চাই। তার উপরেই ত' কাঠামোটা দাঁড়াবে। তা না হলে সবটাই তলিয়ে যাবে।

"হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই", নিত্যানন্দ প্রভু থেকেই আমরা সুদৃঢ় ভিত্তি পেয়ে থাকি।

একদিন নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাড়ীতে এসে হাজির। শচীদেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তখন সেখানে ছিলেন। অন্যান্য ভক্তরাও ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু সম্পূর্ণ দিগম্বর অবস্থায় পৌঁছে গেলেন।

মহাপ্রভু কোনমতে তাঁকে কাপড় পরালেন। পাছে অন্যান্য ভক্তগণ নিত্যানন্দ প্রভুকে ভুল বোঝেন, মহাপ্রভুর এমন আশঙ্কা ছিল। তাই তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর কাছ থেকে তাঁর কৌপীনটি চেয়ে নিয়ে তাকে চিরে টুকরো টুকরো করে উপস্থিত গৃহস্থ ভক্তগণকে দিলেন এবং বললেন, "এটিকে কবচরূপে তোমার বাহুতে বা গলায় ধারণ কর। তা হলেই তোমরা খুব তাড়াতাড়ি ইন্দ্রিয় জয় করতে পারবে।

নিত্যানন্দ প্রভু জিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গুলির উপর তাঁর অসম্ভব প্রভুত্ব। তিনি এই জগতের

কিছুই জানেন না। তাঁর জিতেন্দ্রিয়ত্ব বা বৈরাগ্য এতই তীব্র যে, তিনি স্ত্রী পুরুষ সকলের কাছে পুরো দিগম্বর থাকতে পারেন। তাই নিত্যানন্দ প্রভুই আমাদের চিত্তের স্থিরতাকে, ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে পারবেন। আমাদের হৃদয়ে যদি নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকে, তবে সেই সুদৃঢ় ভিত্তি যে কোন ভার সইতে পারে, তা আমাদিগকে প্রবঞ্চিত করতে পারবে না।

তাই শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ পৃথিবীতে সকল দেশবাসী ভক্তদিগকে নিত্যানন্দের প্রতি ভক্তি করার উপদেশ দিয়েছেন। প্রথমে আমাদের শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা পেতে হবে, তার পরই শ্রীরাধাকৃষ্ণের কৃপা পাওয়া যাবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মানেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ।

'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য।' প্রথমে নিত্যানন্দ প্রভু, তার পরে মহাপ্রভু, তার পরেই রাধাকৃষ্ণ। এই তিন সোপানের মাধ্যমে আমরা ভক্তিপথে উন্নতি লাভ করব।

এখন প্রশ্ন, নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপালাভের উপায়টা কি?

যখন আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও তাঁর ধামের প্রতি অনুরক্তি আসবে তখন আমরা নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভের অধিকার পাব। গৌরলীলার প্রতি যার বিশেষ আকর্ষণ আছে, তারই নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপালাভ সহজ হয়।

গৌরাঙ্গের নাম লও

নিত্যানন্দ প্রভু বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে গিয়ে বললেন, "গৌরাঙ্গের নাম লও, আমি তোমার দাস হয়ে যাব। গৌরাঙ্গের নাম নিয়েই তুমি আমাকে কিনে নিতে পারবে। আর কোন মূল্য বা সর্ত্ত না করেই আমি তোমার কেনা হয়ে যাব। " এই রকমই ছিল তাঁর মনোভাব। মহাপ্রভু যখন শ্রীক্ষেত্রে ছিলেন, তখন তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বঙ্গদেশে পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, "বাংলায় কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণভক্তি বিতরণ করার ব্যক্তি তোমায় ছাড়া আমি অন্য কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। বঙ্গদেশবাসী ত' কেবল তন্ত্র ও স্মৃতি নিয়েই আছে এবং ঐ বাজে জিনিষ নিয়েই তারা মেতে আছে। তারা ত' অহঙ্কারী হয়ে গেছে আর মনে করছে তাঁদের জ্ঞান শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। তাই বঙ্গদেশে প্রচার করা খুবই শক্ত আর তুমি ছাড়া কেউ তাদের জাগাতে পারবে না। উচ্চজাতির কথা ভুলে যাও আর কৃষ্ণনাম নিয়েই জনতার কাছে এগিয়ে যাও। তুমিই এ কাজে যোগ্যতম ব্যক্তি।"

নিত্যানন্দ প্রভু বঙ্গদেশে গেলেন কিন্তু কৃষ্ণনাম প্রচার না করে তিনি মহাপ্রভু

গৌরাঙ্গের নাম প্রচার করলেন। তিনি দেখলেন এদের কাছে কৃষ্ণকথা কৃষ্ণলীলা প্রচার করা ঠিক হবে না। কারণ কৃষ্ণলীলার রাসাদি লীলা, মিথ্যা বলা, চুরিকরা ও আপাত দৃষ্টিতে জাগতিক ইতর লোকের মত ব্যাপার কিন্তু ঐ সমস্ত লীলার রহস্য অত্যন্ত গূঢ়। সাধারণ লোক কৃষ্ণের ঐ সমস্ত লীলার পবিত্রতা ও মর্ম বুঝতে পারবে না। কৃষ্ণের ঐ সব লীলা যে সাধকের পক্ষে সর্বোত্তম সাধনার কথা তা তারা বুঝে উঠতে পারবে না। কিন্তু গৌর লীলা প্রচার করা খুবই সহজ। কৃষ্ণ ত' নিজেই নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য গৌরাঙ্গ হয়ে এসেছেন। গৌরাঙ্গ মানেই হল একটা প্রচণ্ডশক্তি, যা ঔদার্য্যের চরম করুণাঘন বিগ্রহ। সাধারণ লোক এমন কি মহাপাপীর প্রতিও তিনি ক্ষমাসুন্দর মূর্ত্তি। তাই নিত্যানন্দ প্রভু সকলকে গৌরাঙ্গের সঙ্গে যোগযুক্ত করতে চাইলেন; কারণ তা হলেই কৃষ্ণ তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যাবেন। তাই তিনি মহাপ্রভুর আদেশ অমান্য করে সকলকে আহ্বান করলেন।

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে কৃষ্ণ ও বলরাম এবং গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ, এঁদের সম্পর্কের আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

এক সময় শচীদেবী স্বপ্নে দেখেন, কৃষ্ণ ও বলরাম সিংহাসনে বসে আছেন, আর নিত্যানন্দ বলরামকে বলছেন, "সিংহাসন থেকে নেমে এস, এটা দ্বাপর যুগ নয়। এটা কলিযুগ। আমার প্রভু গৌরাঙ্গ এই সিংহাসন অধিকার করবেন, তুমি নেমে এস।"

বলরাম প্রতিরোধ করে বললেন,"কেন আমরা নেমে যাব? আমরা অনেক কাল ধরে এই সিংহাসনে বসে আছি।"

তখন নিত্যানন্দ বলরামকে জোর করে নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন; বলরাম একটু নরম হলেন। নিত্যানন্দ আবার বললেন, "আমার প্রভু গৌরাঙ্গ এখন এই সিংহাসনে বসতে চান, এখন তাঁর যুগ এসে গিয়েছে।"

নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গেরই বেশী পক্ষপাতী। তিনি ত' বলেন, "কৃষ্ণ অনেক দূরে, এখন আমার প্রভু গৌরাঙ্গ।"

তাই আমরা নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে বেশী কৃতজ্ঞ। কেন না, তিনিই আমাদের গুরু। আর গুরুর গুরুত্ব এত বেশী যে, শ্রীল দাস গোস্বামী বলেন, —

"হে রাধারাণী! আমি তোমারই করুণা চাই। তোমাকে বাদ দিয়ে আমি কৃষ্ণের কৃপা চাই না। রাধা-বিরহিত কৃষ্ণকে আমি চাই না।"

স্নিগ্ধভক্তের এইরূপই মনোভাব হওয়া চাই। এই কথাটি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গুর্বাষ্টকে বলতে চেয়েছেন,—

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ং স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

"আমি গুরুদেবের শ্রীচরণ কমল ত্রিসন্ধ্যা বন্দনা করি। তাঁর কৃপাতেই আমরা কৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে পারি। তাঁর কৃপা না হলে আমাদের জীবন বৃথা, তাই আমরা নিরন্তর গুরুদেবের ধ্যান করব এবং কৃপা ভিক্ষা করব।"

সাধনার পথে, ভক্তির পথে, গুরুদেবের স্থান এতই উর্দ্ধে। তার কৃপাতেই আমরা সব কিছু পেতে পারি। কৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত আমাদের কোন গতিই নাই। কৃষ্ণের সঙ্গে যোগযুক্ত করার মালিক একমাত্র গুরুদেব।

যে গুরুদেব আমাকে প্রথমে কৃষ্ণের সঙ্গে যোগযুক্ত করান, তাঁর প্রতি ভক্তি করাই ত' শাস্ত্রনির্দেশ।

গুরুদেব খেলার পুতুল নন

শ্রীগুরু যে একটা খেলার পুতুল নন, নির্জীব একটা আকার মাত্র নন, আমরা যখন একটা বিশেষ আকার বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করি, তখন তাঁকে কেবল মূল আকার বিশিষ্ট মাত্র মনে করা উচিত নয়। তাঁর কথা, উপদেশ, নির্দেশ এ সমস্ত নিয়েই তাঁর গুরুত্ব। ব্যক্তি ও তাঁর উপদেশের সমন্বিত বিগ্রহই গুরুবিগ্রহ বা গুরু-সত্তা। তখন আমিও কেবল একটা দেহমাত্র নই, আমার শিষ্যসত্তা, জিজ্ঞাসু-সত্তাই আমার আসল শিষ্য-পরিচয়। এই যে গুরুশিষ্য সম্পর্ক, তা দুইটি জড় আকার বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্ক নয়; তা হচ্ছে পরমার্থ জিজ্ঞাসু ও জিজ্ঞাস্য তত্ত্ব এই দুই এর সম্পর্ক। আমি এই নামধারী দেহ, এই রং, এই জাতি, এই জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি বিশিষ্ট মাত্র নই। আমার এই সমস্তের ভিতর যা আছে, তা জিজ্ঞাসা আর গুরু নামবিশিষ্ট ব্যক্তি বা আকারের ভিতর যা আছে, তা ঐ জিজ্ঞাস্য বস্তু, তার সঙ্গেই আমার যোগাযোগ। সেই ভিতরের বস্তুই আমার দরকার, এইটিই আমার স্বার্থ। এই স্বার্থের প্রতি আমাদের অবহিত থাকা চাই।

একটি আপেক্ষিক তত্ত্ব, আর একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব। বাহ্যিক আকার মাত্র নয়। আকারকে

ভুলে যেতে হবে, আকারের ভিতর যে আত্মা বিদ্যমান, তার সঙ্গেই সম্পর্ক। তা না হলে কেবল জড়াকারের উপাসনাই হয়ে যাবে।

গুরু চোখে দেখা বস্তুর অতীত তত্ত্ব

শাস্ত্র বলেন,—

"চক্ষুদান দিলা যেই
জন্মে জন্মে প্রভু সেই"

অর্থাৎ গুরুর সঙ্গে সম্পর্ক চিরন্তন। কিন্তু আমরা যে মূল আকারটা চোখে দেখি, আমার গুরু কেবল সেইটুকুই নন, তার বাইরে, তার ঊর্দ্ধে অনেক কিছু। আমাদের দিব্যদৃষ্টি অর্থাৎ আমাদের এই চোখের অজ্ঞান-অন্ধকার যতই ঘুচে যাবে, যতই দৃষ্টি স্বচ্ছ হবে, কৃপালোকের, জ্ঞানালোকের দ্বারা উজ্জ্বল হবে, ততই আমরা গুরুর অপ্রাকৃত স্বরূপ দেখতে পাব।

সংসারে একজন লোককে চেনা যায় প্রথমে তার পোষাক, তারপরে তার দেহ, তার পরে মন, তার পরে তার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে। চোখ জিনিষটা যতই উন্নত হবে, দর্শন ততই নির্ভুল হবে এবং ঐ দর্শনে স্তরে স্তরে পরিবর্ত্তন হতে থাকবে। কৃষ্ণ বলেন,

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"

যিনি আচার্য্য বা গুরু, তিনি আমিই নিজে। এসবই অপ্রাকৃত রাজ্যের ব্যাপার, বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করা হয় মাত্র। তাই ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যগণ এক সময়েও নানা কাজ করে থাকেন।

প্রজ্ঞা ও আদর্শ— এ দুইটি সূক্ষ্ম থেকে স্থূলের দিকে এগোয়। আর চোখের অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা দ্বারাই বিভিন্ন আচার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি স্ফূর্ত্ত হয়। এই স্ফূর্ত্তি ক্রমশঃ এক রস হতে উন্নত রসান্তরে উন্নীত হয়। নৈষ্ঠিক সাধনা বা সাধুর বিশেষ কৃপার দ্বারা সাধক ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন রসের প্রেমসেবা লাভের উন্নততর অধিকার লাভ করে। তখন এক গুরু থেকে উন্নত রসের অন্য গুরুর কাছ থেকে সেবারহস্য জ্ঞান লাভ করতে থাকে। তাই গুরু বলে কেবল একটি মূল আকারের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে তার অন্তর স্বরূপের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হতে হবে। জাতীয় চিন্তাধারায় আবদ্ধ থাকলে চিন্ময়রাজ্যের প্রতি অপরাধ করা হয়।

চোখে দেখা স্থূল আকারের সঙ্গে চিন্ময় বস্তুকে একাকার দর্শন থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। চোখ ত' প্রতারিত করবেই, এই চোখ ত' বাস্তব রূপ ও রং দেখতে

দেয় না। কানও বাস্তব শব্দ শুনাতে পারে না। বাস্তব বস্তু — চিন্ময় পরতত্ত্ব, আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু। সুতরাং সে বস্তুর পরিচয় বা সম্পর্ক লাভের জন্য গুরুদেবই একমাত্র অবলম্বন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গুরুকে চিনব কি করে? তিনি শীতের সময় একপ্রকার পোষাক পরেন, গ্রীষ্মকালে আর এক রকম পোষাক পরেন। তাই আমরা যদি কেবল পোষাকের উপর গুরুত্ব দিই, তবে কি জানতে হবে যে, পোষাকটাই অত্যন্ত জরুরী! গুরু ত' যে কোন দেহ ধারণ করে আমার নিকট আসতে পারেন। হয়ত গুরু যুবক বয়সে আমার কাছে এলেন, আবার তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাঁর শরীরও বৃদ্ধ হয়ে যায়, শরীর বদলে যায়। তখন গুরুকে চিনব কি করে? তফাৎটা জানব কি করে? ধরা যাক, গুরু এ জন্মে একটি দেহ ধারণ করে এলেন। পরজন্মে আর একটি দেহ ধারণ করে এলেন। একই গুরু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করে আসতে পারেন। তাই বাহিরের বিচার ছেড়ে দিয়ে আমরা অন্তরের বিচার গ্রহণ করব।

আমি যখন এই রক্তমাংসের শরীর ছেড়ে দিয়ে সূক্ষ্মশরীর ধারণ করি, সেই ভুমিকায়ও আমি গুরুকে ঐ সূক্ষ্মদেহধারীরূপে দেখাতে পাব। সিদ্ধ, গন্ধর্ব এবং অন্যান্য সাধনসিদ্ধগণ ও সূক্ষ্মদেহে বিচরণ করেন। সেখানেও তাঁদের গুরু আছেন। কিন্তু তাঁদের বা গুরুর কোন রক্তমাংস শরীর নাই তারা সকলেই সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে কারবার করেন।

সুতরাং আমরা যারা সাধনপথে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াসী, তাদের স্থূল জাতীয় বিচার ছেড়ে দিতেই হবে এবং অন্তর্জগতের ভূমিকায় পৌঁছাতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, গুরুর দৃশ্য আকারকে অমর্য্যাদা ও অবহেলা করতে হবে। কিন্তু আসল বস্তু ঐ আকারের ভিতরে রয়েছে।

সেই জন্যই গুরুদেবের উচ্ছিষ্ট, অবশেষ, তার ব্যবহৃত পাদুকা পোষাক-পরিচ্ছদ-এইসবগুলিকেই গুরুর সমান মর্য্যাদা ও ভক্তি অর্পণ করতে হবে। কিন্তু ঐ সমস্ত গুরুর চেয়ে অধিক পূজ্য হতে পারে না। তাই গুরুদেবের শ্রীপাদ সেবা করতে গিয়ে যদি তিনি নিষেধ করেন, অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে তাঁর আদেশ ও ইচ্ছাকেই মেনে নিতে হবে। এই রকমই গুরুসেবার বিচার। এইভাবে সূক্ষ্ম দৃষ্টির দিকে এগোতে হবে।

এখন গুরু কে? কোথায় তাঁকে পাওয়া যাবে? তাঁর আদর্শ কি? তিনি কি চান? এ প্রশ্নগুলিকে অনুধ্যান করা প্রয়োজন। কেবল স্থূলবিচারটাকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকলে ত' চলবে না। আমরা ত' পরমার্থের পথ, ভক্তির পথ আশ্রয় করতে চাই। আধ্যাত্মিক সাধক আধ্যাত্মিক সিদ্ধির জন্য অধ্যাত্মজগতে যেতে চাইছে। তাই যাবতীয় জড়ীয় বিচার,-

তা শারীরিক মানসিক বা বৌদ্ধিক, যাই হোক না কেন, সে সবটাকেই ত্যাগ করতে হবে যদি আমরা সূক্ষ্মজগতের দিকে যাত্রা করি।

প্রগতি : বর্জন ও গ্রহণ

এই মনোভাবই আমাদের প্রগতি ও জীবনের বাস্তব প্রকল্প নির্ণয় করবে। এই সূত্রই যদি আমরা অবলম্বন করি, তবে আমরা উন্নত আধ্যাত্মিক গুণের অধিকারী হতে পারি। আমরা গুরুর সুন্দর আকার, চমৎকার প্রবচন শৈলী এবং অনেক কিছু পছন্দ করতে পারি, কিন্তু কোনটি আসল বা মুখ্য লক্ষণ, যা দিয়ে আমরা অন্য সবটাকেই এড়িয়ে যেতে পারি?

প্রগতির অর্থ বর্জন ও গ্রহণ। পারমার্থিক প্রগতি স্তব্ধতা নয়, এতে নিরবিচ্ছিন্ন গতিশীলতা রয়েছে। তা না হলে ত' আমরা মৃত। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, "জোর যার মুলুক তার" অর্থাৎ প্রকৃতিতে যে শক্ত, সেই বাঁচে। প্রকৃতি প্রতিমুহূর্তে কতকগুলিকে ছেড়ে দেয়, কতকগুলিকে গ্রহণ করে। প্রতিকূলটাকে ছাড়া আর অনুকূলটাকে ধরা। এইভাবে জীবন গতিশীল, পরমার্থ ব্যাপারেও তাই, এটিই প্রগতি।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপা পেতে হলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা চাই। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা পাওয়ার জন্য ভক্তসেবা ও শ্রীধামসেবা চাই। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সর্বোচ্চস্তরের সেবা। তা লাভ করতে হলে সর্বোত্তম পন্থা কি, আদর্শ কি, তা জেনে নেওয়া দরকার। লক্ষ্য স্থির হলে পন্থা স্থির হবে, পন্থা স্থির হলে সিদ্ধিও নিশ্চিত।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রার্থনা করছেন, আমি কেবল একটি মাত্র জিনিষ চাই, তা এই, শ্রীরাধা-মাধব যেখানে একত্র থেকে হাস্যকৌতুকের সহিত লীলাখেলা করেন, আমি সেই রহঃলীলা স্থলীতে থাকতে চাই। এই প্রার্থনাই শ্রীল দাসগোস্বামী নিজ গুরুবন্দনায় বলেছেন,—

> নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
> রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
> রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
> প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥

আমি আমার গুরুদেবের কাছে একান্ত কৃতজ্ঞ। কেন? তিনি আমাকে এত কিছু সম্পদের অধিকারী করেছেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণনাম আমাকে দিয়েছেন। এই শব্দব্রহ্ম সর্বসিদ্ধির আকর। তার পরে তিনি আমাকে মন্ত্র দিয়েছেন, যে মন্ত্রের মধ্যেও নাম আছে।

নাম ছাড়া মন্ত্রের কোন শক্তিই নাই। যদি কৃষ্ণের নাম বাদ দিয়ে ঐ মন্ত্রে অন্য শব্দ যোগ করি, তবে মন্ত্র উল্‌টো ফল দেবে। কৃষ্ণনাম সর্বশক্তিমান্। মন্ত্রের মধ্যে কৃষ্ণনাম একটি বিশেষ কৌশলে অনুস্যূত রয়েছে প্রার্থনা আকারে।

তারপর দাসগোস্বামী বলছেন, তিনি আমাকে শচীসুত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে দিয়েছেন, যিনি একটি সুবর্ণচূড়ার মত দাঁড়িয়ে কৃষ্ণলীলার রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছেন। আর আমার গুরুদেব শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সর্বপ্রিয়তম বিশ্রম্ভ সেবক স্বরূপদামোদর গোস্বামীকে দিয়েছেন, যিনি শ্রীললিতাদেবীর, শ্রীরাধারাণীর প্রিয়তম সখী। তার পর তিনি আমাকে রূপগোস্বামী প্রভুর সঙ্গে যোগযুক্ত করিয়ে দিয়েছেন, যিনি প্রেম সেবা বিতরণ করবার শ্রেষ্ঠ দাতা।

বৈধীভক্তির যে সম্ভ্রমসেবা, তা ত' অনেক নিম্নস্তরের কথা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাগানুগা ভক্তির কথা শ্রীরূপের দ্বারাই বিতরণ করিয়েছেন, যে রাগানুগা ভক্তির দ্বারা শ্রীরাধামাধবের বিশ্রম্ভ রহঃলীলার সেবার অধিকার লাভ করা যায়। শ্রীরূপ গোস্বামীকেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সর্বশ্রেষ্ঠ রাগানুগা ভক্তিমার্গের আচার্য্য বলে নির্ণয় করেছেন, তার পর শ্রীল দাস গোস্বামী বলছেন, তাঁর কৃপায় আমি শ্রীসনাতন গোস্বামীর সান্নিধ্য লাভ করেছি।

শ্রীসনাতন গোস্বামী রাগানুগা ভক্তিমার্গের দিগ্‌দর্শন দেওয়ার অধিকারী। সনাতন গোস্বামী বৈধীভক্তির পথনির্দ্দেশ করে সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ বিভিন্ন তত্ত্বের স্বরূপ, পরতত্ত্বের সহিত জীবের সম্বন্ধ নির্ণয় করে দিয়েছেন।

তারপরে দাস গোস্বামী বলেন, গুরুদেব আমাকে মথুরা মণ্ডল অর্থাৎ শ্রীরাধামাধবের লীলাক্ষেত্র, তার ধূলিকণা, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, যমুনা এ সমস্তই দিয়েছেন। এঁদের দেখে শ্রীরাধামাধবের বিভিন্ন কালের লীলা স্মৃতিপথে উদিত হয়। শ্রীবৃন্দাবন ধাম, শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলার সহায়ক এবং তার সবকিছু লীলার উদ্দীপক।

গুরুদেবের কৃপায় রাধাকৃষ্ণের বিশেষ কেলি-সরোবর রাধাকুণ্ডের সন্ধান আমি পেয়েছি, গিরিগোবর্দ্ধনের পরিচয় পেয়েছি। সব শেষে তিনি আমাকে রাধা-মাধবের রহঃসেবার আশাও দিয়েছেন। এতগুলি সিদ্ধি সম্পদের সন্ধান যাঁর কৃপায় পেয়েছি, সেই গুরুদেবের চরণকমলে আমি নত মস্তকে নিরন্তর বন্দনা করি।"

আমরা, এই সব পারমার্থিক ব্যাপারে যদি সজাগ ও সচেতন হই তবেই আমাদের গুরুবরণ যথার্থ হয়েছে বলা যেতে পারে।

অধ্যায়-৫

বিভুচেতনা ও সংঘ চেতনা

সাধনরাজ্যের পথিক কোনও ধর্মীয় সংঘ আশ্রয় করে সেই সংঘের রীতি নীতি আচার-ব্যবহার ও তত্ত্ববিচারে নিষ্ণাত হয়ে সাধন পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু মাঝখানে নানাপ্রকার বিচার এসে ঐ পরমার্থ সাধন পথে ব্যাঘাত জন্মাতে পারে। সামাজিক বা কর্মক্ষেত্রের বাধ্য-বাধকতা এসে তাকে বিচলিত করতে পারে। একান্তভাবে ভক্তিনিষ্ঠ হওয়ার জন্য সমাজের প্রতি তার বক্তব্যের অবহেলা ও ব্যতিক্রম হতে পারে। সমাজে বা কর্মক্ষেত্রে ঐ ব্যতিক্রমের জন্য সাধককে অনেক সময় অনেক সংঘাত বা দোদুল্যমান অবস্থায় পড়তে হয়। সমাজের নিন্দা ও শত্রুতার স্বীকার হতে হয়; কর্মক্ষেত্রেও বহুবিধ উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। এ প্রকার পরিস্থিতিতে সাধকের কোন বিচার ও পন্থা অবলম্বন করা উচিত? উচ্চ কর্তৃপক্ষদের বিধি-নিষেধ সব সময় মেনে চলা সম্ভব হয় না।

এ সমস্ত দিকের সামগ্রিক বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রগতির অর্থ বর্জন ও গ্রহণ, যখন আপেক্ষিক গুরুত্ব ও সার্বভৌম গুরুত্ব— এ দুইয়ের সংঘাত যুগপৎ আসে, তখন আপেক্ষিক গুরুত্বের চেয়ে সার্বভৌম গুরুত্বের মূল্য বেশী।

ধরা যাক, একজন আমেরিকান্ নাগরিক অন্তরে সমাজবাদী। সাধারণ জীবনে সে আমেরিকার অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে। কিন্তু যখন ক্যাপিটালিস্ট ও সোসিয়ালিস্টদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়, তখন কোন্ পক্ষ অবলম্বন করবে?

নীতিগতভাবে সে যদিও সাম্যবাদী কিন্তু যে দেশে বাস করছে, সে দেশে অধিকাংশ ক্যাপিটালিষ্ট। যখন কোন বিবাদ নাই তখন সবই ঠিকভাবে চলে। কিন্তু যখন ক্যাপিটালিষ্ট ও সাম্যবাদী বা সোসিয়ালিষ্টের বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন যে ব্যক্তি কেবল অন্তরে সাম্যবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী বা অনুরক্ত, সে বাইরে কোন বিবাদীয় পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ থাকে, মিলে মিশে বিবাদ এড়িয়ে চলে। কিন্তু যদি সে একজন পুরাপুরি সাম্যবাদী নেতা হয়, বহু কর্মীদের নেতৃত্ব দিয়ে গোষ্ঠীর ধারকবাহক বা কর্মকর্ত্তাদের মধ্যে একজন হয়,

তবে সে নিজ গোষ্ঠীর নীতিতে একনিষ্ঠ থাকবে, দরকার হলে দেশ ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু নীতিভ্রষ্ট বা সুবিধাবাদী হবে না।

সুতরাং স্বার্থ দুই প্রকার, সাময়িক ও চিরন্তন শাশ্বত স্বার্থ। আমরা নীতিভ্রষ্ট বা সুবিধাবাদী হতে পারি না। নিজের শাশ্বত স্বার্থ বা পরমার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বা অবহেলা প্রদর্শন করতে পারি না।

পরমার্থের জন্য আমরা পরিবার ছাড়তে পারি, সমাজ ছাড়তে পারি। বৈষ্ণবতার পবিত্র আদর্শটাই সবচেয়ে মুখ্য ও মূল্যবান্। বাহ্যিক আচার বা নীতি নিয়মটাই সব কিছু নয়। আপেক্ষিক বা আংশিক প্রয়োজন সামগ্রিক প্রয়োজনের সহায়তারূপে বিচার্য্য। উচ্চতর আদর্শ আমাদিগকে সর্বদা উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে প্রেরণা দেয়। পারমার্থিক জীবনে মহান্ আদর্শ কেবল এগিয়ে যেতে ঠেল্‌তে থাকে, এক জায়গায় থেমে যেতে দেয় না।

ক্যাথলিক, প্রোটেস্‌টাণ্ট ও পিউরিটান্

আমরা সাধকের স্তরে আছি। আমরা এগিয়ে যেতে চাই, এক অবস্থায় আবদ্ধ থাকতে চাই না। পেছন দিকে ফিরে যেতে চাই না। বাইরের স্থূল বিধি-বিধান আমাকে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বা অবস্থায় কিছুটা সাহায্য করে মাত্র। কিন্তু মহান্ আদর্শ নিষ্ঠা আমাদিগকে আরও আরও উর্দ্ধে যেতে প্ররোচিত করে। সমাজে সব দলেই প্রগ্রেসিভ্ গোষ্ঠী আছে, যেমন প্রোগ্রেসিভ্ কম্যুনিস্ট, প্রোগ্রেসিভ্ খ্রিষ্টিয়ান ইত্যাদি। প্রথমে ছিল ক্যাথলিক, তার পরে প্রোটেস্টান্ট, আবার পিউরিটান, এইভাবে খৃষ্টানধর্ম সম্প্রদায় এগিয়ে চলেছে। তাই ক্রমবিকাশ বা উন্নয়ন ঠিকপথে হতে পারে আবার ভুল পথেও হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণানুশীলন গতিশীল আর জীবন্ত, তাই সমন্বয় ও পুনঃসমন্বয় সর্বদা হয়েই চলেছে, আর তার সঙ্গে তাল দিয়ে আমরাও পরিবর্ত্তনটাকে মেনে নিয়ে চলেছি, কিন্তু নিজের চরম লক্ষ্য যেন ভুলে না যাই, মূল আদর্শ যেন ত্যাগ করা হয়ে না যায়। তার প্রতি সজাগ থাকতে হবে।

প্রকৃতির নিয়মে কোন ব্যক্তি কোন এক ভূখণ্ডে জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু তার উচ্চ আদর্শবোধ তাকে দেশ ছেড়ে দিতে বাধ্য করে। আইনষ্টাইন্ জার্মান ছেড়ে নিজের আদর্শ নিষ্ঠার জন্য আমেরিকায় বাস করলেন। পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। সর্বোত্তম আদর্শই আমাদের জীবনের মূল্যবান সম্পদ, তাই আমাদের জীবন সর্বস্ব।

শাস্ত্রে অনেকপ্রকার উপদেশ দেওয়া আছে দেখতে পাই। সে সব ঐ সর্বোত্তম

আদর্শের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রেরণা দেয়, সাহায্য করে। কিন্তু তা ব্যতিরেকভাবে করে থাকে। 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ', কোন সময় কোন বিশেষ কারণে আমাদের অতিপ্রিয় ব্যক্তির স্বার্থে আদর্শকেও ছাড়তে হয়। কিন্তু শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

অর্থাৎ আদর্শের জন্য নিজের প্রিয় ব্যক্তিকেও ছাড়, আমার শরণ গ্রহণ কর। আমিই শাস্ত্রের সার। আদর্শের জন্য পরিবার, স্বজন, স্বদেশ সব কিছু ছেড়ে দেয় আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ। তারা সব ছাড়তে পারে, কিন্তু আদর্শ ছাড়তে পারে না।

গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন, "নিজের কর্ত্তব্য করতে গিয়ে মরে যাওয়া ভাল কিন্তু অন্যের বৃত্তি গ্রহণ করা উচিত নয়।" এ কথা সাধারণ স্তরের কথা, সাধারণ কর্ত্তব্যের কথা, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যের বেলায় বলেছেন, —

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

"সবই ছেড়ে দাও। সোজা আমার কাছে চলে এস।" এটি একটি বৈপ্লবিক পন্থা। এইটিই সর্বোচ্চ, আর আপেক্ষিক পন্থা হল "স্বধর্মে থাক তা ছেড়ে দিও না।" এইটা জাতীয় ভাবধারা। জাতীয়তা বোধ আর ভগবৎভাবনা, সামাজিক কর্ত্তব্যবোধ আর ভগবৎচেতনা এ দুইএর মধ্যে ভগবৎচেতনাই সর্বোচ্চ। তার উপরে আর কিছু নাই। যদি জাতীয়তাবোধ ভগবৎচেতনাতে বাধা সৃষ্টি করে, তবে জাতীয় ভাবনাকে বিসর্জন দিতে হবে। এই কথাটিই শ্রীমদ্‌ভাগবতে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, —

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত মৃত্যুম্ ॥

অর্থাৎ গুরু, স্বজন, পিতা, মাতা, পতি, বা দেবতা যেই হোক না কেন, যদি সমাগত মৃত্যু হতে রক্ষা করতে না পারে, তবে তারা কেউই নয়, সকলকেই তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দেওয়া উচিত। সাধারণ লোক ত' দূরের কথা, গুরুকেও ছাড়তে পারা যায়।

পরমার্থ পথ প্রদর্শক গুরুকেও প্রয়োজন হলে ছেড়ে দিতে পারা যায়, যদি দেখা যায় তিনি যথার্থ ভাবে ভগবৎ প্রাপ্তিতে সাহায্য করতে না পারেন। বলি মহারাজ গুরু শুক্রাচার্য্যের নির্দেশ অমান্য করলেন। বিভীষণ নিজের স্বজনকেও পরিত্যাগ করলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ নিজ পিতাকেও পরিত্যাগ করলেন। ভরত মহারাজ নিজ মাতাকে, খট্বাঙ্গ মহারাজ দেবতাগণকে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নীগণ নিজ নিজ স্বামীকেও পরিত্যাগ করলেন।

আমরা সংঘকে ধরে থাকি আমাদের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য। কিন্তু তা করতে গিয়ে যদি আমাদের নীচে নেমে যাওয়ার মুহূর্ত্ত আসে, তখন সংঘকেও ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। এই নৈমিত্তিক ও নিত্য এ দুইটির মধ্যে সংঘাত হলে নৈমিত্তিক প্রয়োজনকে ছাড়তে হয়। অন্তরে যদি অনুভব করি যে, এই অবস্থা আমার ভজনের অনুকূল নয়, তবে সেই অবস্থা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে হবে। এ ছাড়া কপটতা করে দুইএর সম্পর্ক রাখা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। তাতে উন্নতি বাধা পেয়ে থাকে।

আমরা যদি নিজের সর্বোচ্চ স্বার্থ অর্থাৎ পরমার্থের জন্য একান্ত নিষ্ঠাবান্ হই, আন্তরিক প্রযত্ন করি, তবে কেউ আমাদের প্রতারিত করতে পারে না, বাধা দিতে পারে না। "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

যে ব্যক্তি পরম মঙ্গলকারী তার কোনও অমঙ্গল হতেই পারে না। পরমার্থ সম্পর্কে যে সাধক ঐকান্তিক আগ্রহী, ভগবৎশরণাগত, তার কোনও অসুবিধা হতেই পারে না।

গুরুদেবের অপ্রকট

নিজের দীক্ষাগুরু যদি অপ্রকট হন, সে অবস্থায় সাধক-শিষ্যের কিভাবে সাধনপথে অগ্রসর হতে হবে, এ সমস্যা সাধকজীবনে আসা স্বাভাবিক।

পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সবসময় অনুকূল থাকে না, সময়ে সময়ে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষত দীক্ষা গুরুদেব যদি হঠাৎ অপ্রকট হয়ে যান, তবে শিষ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। শিষ্যদের মধ্যে বিবাদ ও সংঘাত দেখা যায়। ঐ প্রকার পরিস্থিতিতে ঐকান্তিক আগ্রহযুক্ত সাধকশিষ্য যথেষ্ট বিবেচনা ধৈর্য্য ও ভজনানুকূল সূক্ষ্মবিচার বোধের দ্বারা পরিচালিত না হলে বিপদ আছে। এটা ত' একটা পরীক্ষার সময়, আত্মসমীক্ষা বা আত্মনিক্ষেপের অবসর। আমরা এ যাবৎ শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে যে সমস্ত নির্দেশ উপদেশ লাভ করেছি, তার যথার্থ মর্ম কতটা গ্রহণ করতে পেরেছি, তারই এটা পরীক্ষার সময়। আমরা কেবল কতকগুলি স্থূল আচার বিধি-নিষেধের মধ্যে নিজেকে চালিত করে পরমার্থ সাধন হয়ে গেল, গুরুসেবা হয়ে গেল বলে নিশ্চিত থাকছি, না কৃষ্ণকৃপার জন্য উত্তরোত্তর আন্তরিক আর্ত্তি, ব্যাকুলতা বৃদ্ধি হওয়ার সাধন করছি, তাঁর ও শাস্ত্রের সদুপদেশগুলি নিজ আচরণে গ্রহণ করবার প্রয়াস করছি, তারই জমা খরচের হিসাব নিকাশের সময়, এ সব বিচার করতে হবে। সৎ শিষ্য-সাধক ও শিষ্য-সাধক বেশধারী কপট বৈষ্ণব ত' এককথা নয়। গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ আমাদের অন্তরে কতটা গভীর রেখাপাত করেছে, তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। আমরা প্রকৃত শিষ্যত্ব

গ্রহণ করেছি না শিষ্যের অভিনয় মাত্র করেছি, তার পরীক্ষার সময় ত' এইটাই, এটা ত' আগুন, এই আগুনে নকল শিষ্য পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

আর আসল শিষ্য আরও উজ্জ্বল হয়ে সকলের সামনে উদ্‌ভাসিত হয়ে দাঁড়াবে।

কর্মবন্ধন

সুতরাং ঐ প্রকার বিড়ম্বিত পরিস্থিতিতে আমাদের ভয় পাওয়ার কিছুই নাই। কৃষ্ণ আবার গীতায় বলছেন, —

"সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্" ॥

আনাড়ি কর্মকার নিজ হাতিয়ার গুলির উপরও রাগ দেখায়। আমাদের কর্ম আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। আমাদের ঘিরে ফেলেছে। এই অসুবিধাগুলো ত' আমাদের কর্মেরই ফল। যা এড়ান যায় না তার মোকাবিলা করাই ত' যথার্থ যোদ্ধার পরিচয়।

এ প্রকার পরিস্থিতিতে আমাদের নিজের মধ্যে জিজ্ঞাসা হওয়া দরকার। আমি কোথায় আছি? আমার প্রকৃত প্রয়োজনটা কি? বাস্তব বস্তু লাভের জন্য আমার কতটুকু আর্ত্তি এসেছে? এই সব প্রশ্নের মীমাংসা ত' নিজের ভিতরেই করতে হবে। এইটাই ত' প্রকৃত সাধনার বেলা। সাধনে প্রগতির প্রমাণই ত' এইসব বাধা বিপত্তি।

আমাদের শোধন করে নির্মল করার জন্য এই প্রতিবন্ধকগুলির সার্থকতা আছে, তাই এসেছে। পরীক্ষা না এলে প্রগতি বুঝা যায় না। আমরা এ যাবৎ প্রকৃত শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি, না লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য শিষ্যত্বের অভিনয় মাত্র করেছি, তার অগ্নিপরীক্ষা এসেছে, তাই সৎসাধকের, প্রকৃত শিষ্যের এতে ভয় হয় না, সে আরও উৎসাহ ও নিশ্চয়তার সহিত ধৈর্য্যের সহিত সাধনে একনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে।

ভগবানের কোন ভুল হয় না। সমগ্র সৃষ্টিকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। এটা আমাদের দায়িত্ব নয়। আমি যদি নিষ্কপট হই তবে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে, আমরা প্রকৃত দেশপ্রেমী কি না তাত' যুদ্ধক্ষেত্রেই পরীক্ষা হয়। আমি সাধু-গুরু, গৌর, কৃষ্ণ, রাধাগোবিন্দ, এঁদের শরণাগত। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আমি এঁদের ছেড়ে যাচ্ছি না। সকলেই আমাকে ত্যাগ করে চলে যেতে পারে, আমি কিন্তু আমার নিষ্ঠায় শরণাগতিতে অবিচলিত থাকব। তা হলে গুরুবর্গ অদৃশ্য থেকেই আমার উপর তাঁদের শুভাশীষের ধারা বর্ষণ করবেন।

আমাদের নিজের আত্মসমীক্ষা করা দরকার যে আমরা কি পরিমাণে স্বার্থপর? আমাদের মধ্যে আমাদের পূর্ব অনভিপ্রেত খারাপ অভ্যাস বা "অনর্থ" এখনও কতটা আমাদের হৃদয়ে থাকছে। কর্ম, জ্ঞান, মনের বাসনা এবং অন্যান্য অপবিত্র চিন্তা আমাদের মধ্যে থেকে আমাদের ভক্তিপথের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে কতটা মিশে রয়েছে। সেগুলি সবই বেরিয়ে আসা চাই এবং সেগুলি দূরীভূত হওয়া চাই। আমরা যদি সত্যিই ভাল চাই, তা হলে কেউ তাতে বাধা দিতে পারে না। এই প্রকার মনোবৃত্তি নিয়ে আমরা এগিয়ে গেলে তখন বুঝতে পারব কোনটা কি?

যিশু ও যুডাস

এমন কি যিশুখৃষ্ট তাঁর অনুগতগণদের বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে প্রতারিত করবে।" যুডাস তাঁর বারজন শিষ্যের একজন ছিলেন। তাই যিশু বললেন, "তোমাদের বার জনের মধ্যে একজন আছে, যে আমাকে শত্রুদের হাতে আজ রাতেই ধরিয়ে দেবে।" এও সম্ভব হতে পারে। তিনি বললেন, "এমন কি পিটার, তুমিও আমাকে মুরগী ডাকার পূর্বে তিনবার অস্বীকার করবে।"

"ওঃ! না না, আমি আপনাকে অস্বীকার করতে পারি না।"

কিন্তু কোন ভক্তের অহংকার ভগবান্ সহ্য করতে পারেন না। তিনি কেবল শরণাগতিই চান— সম্পূর্ণ শরণাগতি।

"না না"— পিটার বলল, "আমি আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য।" এই ধরণের অহমিকা কিন্তু টিকতে পারে না।

পিটার তাদের দলের নেতা ছিল। সেও ধরা পড়ে গেল। তাই কোন প্রকার অহমিকা ভগবান্ সহ্য করতে পারেন না।

ভগবানের কাছে ভক্তগণ যন্ত্রের মত। একজন মুসলমান সম্রাট্ একবার একজন 'হাঁ জী' বলার লোকের জন্য বিজ্ঞাপন দিলেন। পূর্বে রাজ-দরবারে ঐ প্রকার তোষামুদে লোক থাকতেন। রাজা যা কিছু বলবেন, সে তাকেই সায় দেবে। সম্রাটের তোষামুদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচারিত হলে অনেকেই সেই কাজের জন্য আবেদন করলেন। তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হল।

"তুমি তোমার দায়িত্ব ঠিকভাবে করতে পারবে বলে মনে কর?"

— "হাঁ আমি পারব।"

"আমি ত' মনে করি, তুমি ঠিকভাবে করতে পারবে না?"

— "না স্যার্, আমি নিশ্চয়ই পারব।"

এরকম সকলেই বরখাস্ত হয়ে গেল। কেবল একজনই রইল। যখন রাজা তাকে বললেন, "আমি ত' মনে করি তুমি তোষামুদের কর্ত্তব্য করতে পারবে না।"

সেই একজন বলল,

— "আমিও তাই ভাবছি, মনে হচ্ছে আমি পারব না।"

"না না, তুমিই ঠিক পারবে। তুমিই যোগ্যতম ব্যক্তি।"

— "হাঁ আমিই ঠিক পারব। মনে হচ্ছে আমিই যোগ্যতম।"

"না না, আমার ত' সন্দেহ হচ্ছে?"

— "হাঁ! আমার ত' তাই সন্দেহ হচ্ছে, বোধহয় পারব না।"

রাজা বললেন, "এইটিই এই কাজের যোগ্য ব্যক্তি।"

যারা যোগ্য বলে দাবি করল, তারা সবই প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেল।

তাই আমাদের আত্মারও সেই প্রকার নমনীয়তা ভগবানের সেবায় থাকা দরকার। আমাদের কোন প্রকার 'ইগো' অহংকার যেন না থাকে।

অবশ্য এটা বাহ্য বিচারের কথা। আমাদের স্থায়ী ইগো বা অহং আছেই। যখন আত্মা সেই উন্নত ভূমিকায় প্রবেশ করে, তখন ঐ অহং বা ইগো একটি ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু এই জাতীয় ইগো বা অহং পুরোপুরি দূর হওয়া দরকার। কিন্তু যখন তাকে খাঁটি আগুনে ফেলা যাবে, তখন তা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

এখন আমাদের একাগ্র হওয়া একান্ত দরকার। দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব ও কৌরবদের অস্ত্রশিক্ষা গুরু ছিলেন। একদিন তিনি শিষ্যদের পরীক্ষা করছিলেন। তিনি একটা গাছের উপরে একটা কৃত্রিম পাখী রেখে দিলেন। এক এক করে তিনি সব ভাইগুলিকে লক্ষ্যভেদ করার জন্য আহ্বান করলেন।

যুধিষ্ঠির এগিয়ে গেলেন। দ্রোণাচার্য্য জিজ্ঞাসা করলেন, "পাখীটাকে আঘাত করতে প্রস্তুত হও। তুমি প্রস্তুত ত'?"

— "হাঁ!"

"কি দেখতে পাচ্ছ?"

— "আমি পাখীটাকে দেখছি।"

"আর কিছু দেখছ কি?"

— "হাঁ! গাছপালা, আপনাদের সকলকে দেখছি।"

"চলে যাও।"

তার পরে আর একজন এলেন। দ্রোণাচার্য্য আদেশ দিলেন, "পাখীর চোখটাতে তীর ছুঁড়ো, এখন লক্ষ্য স্থির কর।"

"কি দেখছ?"

— "পাখীটাকে।"

"আর কিছু?"

— "হাঁ গাছটাকে দেখছি।"

"তা, চলে যাও"

সর্ব শেষে অর্জুন এলেন। দ্রোণাচার্য্য বললেন, "প্রস্তুত হও।"

— "হাঁ গুরুদেব, আমি প্রস্তুত।"

"পাখীটাকে দেখছ কি?"

— "হাঁ দেখছি।"

"গাছটা?"

— "না।"

"পুরো পাখীটা ত?"

— "না।"

"তবে কি দেখছ?"

— "কেবল মাথাটাই।"

"পুরো মাথাটা?"

— "না।"

"তবে কি দেখছ?"

— "কেবল চোখটাই।"

"তুমি আর কিছুই দেখছ না!"

— "না আর কিছুই দেখছি না!"

"হাঁ বাবা এবার লক্ষ্যভেদ কর।"

এই প্রকার একাগ্রতাই আমাদের জীবনে একান্ত প্রয়োজন। কর বা মর। যে কোন ভয়ানক বা বিপজ্জনক পরিস্থিতি আসুক না কেন, আমি তাতে বিচলিত বা ভীতসন্ত্রস্ত হব না। এমন কি আমার নিজের লোকই যদি শত্রু হয়, তবে তাতেও চিন্তা নাই। আমার নিজজন ত' একমাত্র ভগবান্। আর কেউ তাঁর প্রতিযোগী হবে, তা তিনি সহ্য করতে পারেন না।

তিনি সর্বশক্তিমান্। তিনিই ত' আমার একমাত্র মালিক। আর কেউ আমার উপর মালিকানায় ভাগ বসায়, তা তিনি কখনও সহ্য করতে পারেন না। এইভাবে আমার ভগবৎচেতনা, পরমার্থচেতনা আমাকে যে দিকে নিয়ে যাবে, আমি সেই দিকেই যাব। ভগবদিচ্ছায় মিত্ররাও শত্রু হতে পারে, কিন্তু আমি আমার আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ থাকব। প্রগতির ধারা থাকলে বর্জন ও গ্রহণ ত' থাকবেই। ভগবদনুভূতির ক্রমপন্থায় এ সব এড়িয়ে যাওয়া চলে না।

যখন আমরা স্কুলে পড়ি, কেউ ফেল্ করে, কেউ পাস্ করে। যারা পাস্ করে তারা নূতন ক্লাসমেটদের সঙ্গে মিশে, তার পরে আবার পাস্ করে, আবার নূতন ক্লাসমেটদের সঙ্গ পায়। পুরাতন বন্ধুগণ হয় ত' ফেল করে পিছিয়ে পড়ে। এইভাবে চলতে থাকে। এটা ত' স্বাভাবিক। তার অর্থ এই নয় যে আমরা অন্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। আমরা তাদের জন্য সহানুভূতি দেখাই, তাদের সাহায্য করি। তবুও দেখা যায়, তাতে কাজ হয় না। পারমার্থিক রাজ্যেরও তাই। অতএব সংঘাত হবেই। নিত্যস্বার্থ যা তার জন্য নৈমিত্তিক স্বার্থকে ত্যাগ করতেই হবে।

মনের কারাগার

তবুও নৈমিত্তিক স্বার্থের প্রয়োজন রয়েছে। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকের প্রতি যদি শ্রদ্ধা না থাকে তবে উন্নতিতে বাধা আসবে। ছাত্রের এটা বুঝা দরকার যে তিনি যা শিক্ষা দিচ্ছেন, সে সব মিথ্যা নয় বা নিম্নস্তরের শিক্ষা নয়। যখন সে বড় হয়, তখন উচ্চ শিক্ষার জন্য তাকে উচ্চতর শিক্ষকের কাছে যেতে হয়। তার অর্থ এই নয় যে, সে প্রাথমিক শিক্ষককে অপমান করে বা অবহেলা করে।

আমাদের গুরুদেব যা দিয়ে গিয়েছেন, তার অনুকূল ও আরও উন্নত শিক্ষা যদি কোথাও অন্য কোন সমচিত্ত ও স্নিগ্ধ ব্যক্তিতে পাই তবে, তার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করায় প্রাথমিক গুরুর অমর্য্যাদা হয় না। আমরা গুরুদেবের অনুরূপ উপদেশ যেখান থেকে পাই, তাতে আমাদের সাধনপথে সাহায্যই হয়ে থাকে। অন্য সাধুর উপদেশ যদি আমার গুরুর

উপদেশের সমস্তরের হয়, তাতে আমাদের গুরুদেবের উপদেশ জীবনে সফল ও কার্য্যে পরিণত করার সহায়ক হয়। তা ছাড়া আমরা নিজের মনের মধ্যে যা সঞ্চয় করেছি, তাতেই ভগবান্‌কে পাওয়া যাবে না। ভগবান্ ত' সীমিত বস্তু নন যে, আমার সীমিত সামান্য সঞ্চিত বুদ্ধিজ্ঞানের সীমার মধ্যে এসে যাবেন। ভগবান্ অসীম, তাকে আমার মনের এইটুকু ছোট্ট কুঠুরীর মধ্যে বন্দী করে রেখে দেওয়া সম্ভব কি! আমি কি ঐ টুকুতেই রুদ্ধ হয়ে থেকে যাব? আমি এ যাবৎ আমার গুরুর কাছে যা পেয়েছি, তা ত' একটা স্তরে বা একটা বিন্দুতে থেমে যাওয়ার জিনিষ নয়। তা ত' অনন্ত অসীমের দিকে যাত্রা; তার আবার শেষ কোথায়? আমি কি শেষ কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে গেছি? আর কি আমার এগিয়ে যাওয়ার কিছুই নাই?

কেউ যদি মনে করেন যে, তিনি সিদ্ধিলাভ করে ফেলেছেন, সবই তাঁর জানা হয়ে গিয়েছে, তবে তাঁকে দূর থেকে নমস্কার করা দরকার। এই রকম তৃপ্তি বা সন্তোষকে আমরা ঘৃণা করি। একজন আচার্য্যেরও মনে করা দরকার যে তিনি এখনও শিষ্য, তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। পরমার্থ রাজ্যের সিদ্ধ সাধক সকলেই জানেন, তাঁরা অসীমের দিকে এগিয়ে চলেছেন। এ চলার শেষ নাই। এ যাত্রাও অসীম। সসীম ও অসীমের এই বিচার সংঘাত চিরকালই আছে। কারণ এখানে সবই অসীম।

আমাদের জানার শেষ নাই, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও বলেন, "প্রভো! আমি তোমার দেওয়া ক্ষমতার দ্বারা প্রতারিত হয়েছি, আমার স্থিতি কোথায় তোমা ছাড়া।"

যারা অসীমের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েছেন, তারা ত' মনে করে, আমি কিছুই নই, আমার কিছুই হল না। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মত ভক্তও বলে থাকেন, "আমি বিষ্ঠার কীট হতেও অধম।" এটা তাঁর অন্তরের দৈন্যবোধ। এই দৈন্যবোধ, কার্পণ্যই ভক্তের সম্পদ। যে বলে সে ভগবান্ হয়ে গিয়েছে, মহাপুরুষগণও তার শিষ্য, সে ব্যক্তি জগতের সবচেয়ে বড় শত্রু। তার সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা দরকার।

অধ্যায়-৬

“আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ”

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, —

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভুরিদা জনাঃ ॥

ভাঃ ১০।৩১।৯

“হে কৃষ্ণ! তোমার কথামৃত ও লীলামৃত আমাদের জীবাতু, আমরা ত' এই জড় জগতের জ্বালায় সর্বদাই দগ্ধীভূত হচ্ছি। সাধুগণ তোমার কথামৃতকে জগতে বিতরণ করেন, তার দ্বারাই জীবের পাপ-তাপ ধ্বংস হয়ে যায়। তোমার কথামৃত অতি পবিত্র, সর্বশক্তিমান্। যাঁরা তোমার কথামৃত জগতে বিতরণ করেন, তাঁরা জগতে সব চেয়ে বড় উপকার করে থাকেন, তাঁরাই সব চেয়ে দাতা, দয়ালু ও পরোপকারী।”

এইটিই সর্বজনীন প্রয়োজন। কৃষ্ণের কথামৃত ও লীলামৃত প্রত্যেকেরই হৃদয়, মন ও কর্ণ রসায়ন। তার কারণ, কৃষ্ণ রসস্বরূপ। “রসো বৈ সঃ” যাবতীয় আনন্দরসামৃতসিন্ধু। অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ। রসবিগ্রহ্। কৃষ্ণের সবই মধুর।

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥

কৃষ্ণ তোমার অপ্রাকৃত বপুর সৌন্দর্য্য অতি মধুর, মধুর, তার মধ্যে বদনকমল

তিনগুণ মধুর, আবার ঐ শ্রীমুখের অধরে যে মৃদুহাসি, তা চতুর্গুণ মধুর। মধুর স্বাদ হতে চতুর্গুণ মধুর।

এই শ্লোকটি বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃতে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, কৃষ্ণের সবই মধুর। কৃষ্ণ মাধুর্য্য রসবিগ্রহ, আমি প্রথম দর্শনে মনে করলাম কৃষ্ণই মদন, যে মদন সকলকে মোহিত করে। কিন্তু পরে দেখলাম, না, এত ঠিক মদনও নয়, কারণ মদন ত' জড় জগতের প্রাণিগণকে কামমোহিত করে। কিন্তু কৃষ্ণের সবই চিন্ময়, জড়ের কালিমা ত' তাতে একটুকুও নাই। কৃষ্ণের এই মাধুর্য্য ত' চিন্ময় জগতের। এ মাধুর্য্য আমার নয়ন মনকে মাধুর্য্যরসে ডুবিয়ে ফেলেছে, কেবল মধুর অঝোর বারি ধারা বর্ষণ হয়ে চলেছে। হ্যাঁ, কৃষ্ণই আমার চিত্ত জয় করে ফেলেছে। আমিও তাঁর মাধুর্য্যরসে বন্দী হয়ে গিয়েছি।

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽজয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥

হে সখি! সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান কন্দর্পস্বরূপ কৃষ্ণ কোথায়? সেই মধুর দ্যুতিকদম্ব কৃষ্ণ কোথায়? মূর্ত্তিমান মাধুর্য্য সেই কৃষ্ণ কোথায়? আমার নয়নমনের নিধি কৃষ্ণ কোথায়? গোপীগণের বেণীবন্ধন শিথিলকারী সেই কৃষ্ণ কোথায়? এই ত! এই ত' আমার জীবনের জীবন দিব্যমাধুর্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণ আমার চোখের সাম্‌নেই দেখতে পাচ্ছি!

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর কৃষ্ণকর্ণামৃতে এই বিরহবেদনা ব্যক্ত করেছেন। বিরহের যাবতীয় বিভাব, যাবতীয় বেদনার উপশম হয় এই কথামৃতের দ্বারা। এই বিরহ গীতিই আমাদিগকে যাবতীয় সংসার দুঃখদাবানলের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে আমাদের ঐ অপ্রাকৃত ব্রজলীলার সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের স্বরূপেই ঐ উপাদান রয়েছে। যারা কেবল যুক্তি বা বিচার প্রধান চিত্তবৃত্তি বিশিষ্ট, যারা বলেন, কৃষ্ণচেতনার দ্বারা কেবল পাপতাপ দূর হয় মাত্র। কিন্তু এই জগতের পাপরাশি ত' সামান্য মাত্র। কৃষ্ণনাম উচ্চারণ মাত্র যাবতীয় পাপরাশি সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়, কেবল সেইটুকু নয়, আমাদের নিত্য স্বরূপের বিকাশ আরম্ভ হয়ে যায় (শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং) সমগ্র কল্যাণরাশির আকর কৃষ্ণনাম যাঁরা জগতে বিতরণ করতে আরম্ভ করেছেন তারা জগৎ উদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হয়েছেন। এই কৃষ্ণচেতনার বিকাশ ও বিস্তার দ্বারাই জগতে জীব সংসারদুঃখ থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি পেয়ে নিত্য কৃষ্ণসেবায় নিযুক্তি পেয়ে যাবে।

মাধুর্য্যামৃত

কৃষ্ণচেতনা মাধুর্য্যের অমৃত, সেই অমৃত যতই বিতরণ করবেন, ততই ত' আপনাদের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে থাকবে। তা কখনও শেষ হবে না। যতই বিলাবে, ততই ভরবে। কৃষ্ণস্বরূপের মাধুর্য্য অফুরন্ত, যত বিলাবে, তত বাড়বে। কৃষ্ণ ত' মাধুর্য্যের অনন্ত আকর, তাই কেবল বিলিয়ে যাও। মহাপ্রভু ত' নিজেই বলে গেলেন, কেবল বলে গেলেন না, আদেশ করে গেলেন।

যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ ॥

যাকেই দেখ, তাকেই কৃষ্ণকথা বল, আমাদের আর কোন কাজই নাই কেবল কৃষ্ণকথা ছাড়া। যাকে দেখ, সে যে দেশের, যে জাতের, যে বর্ণের হোক না কেন, তাকে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ-কথা বিতরণ কর, আমি আদেশ দিচ্ছি, ভয় নাই, গুরুর আসন গ্রহণ কর, কৃষ্ণনাম বিলাও, এতে কোনো অসুবিধা হবে না। তাই মহাপ্রভু আবার ভরসা দিলেন,

কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঁই পাবে মোর সঙ্গ ॥

এই প্রচারকার্য্যে তুমি আমার সাহায্য পাবে, যদি আমার আদেশ পালন কর, তবে দেখবে আমিই সেখানে আছি, তোমার সঙ্গেই আছি, এই কাজে তোমাকে এগিয়ে দিচ্ছি।

তাই তোমাদের প্রভুই তোমাদের এই কাজে নিয়োগ করেছেন। এই জগতে জন্ম-মৃত্যুর সংসারে তোমরা সেবা কাজ করে যাও। যে ভাবেই হোক, আমরা নিজেরা ত' কৃষ্ণচেতনায় নিষ্ণাত হয়েছি, অন্যান্য ব্যক্তি দিগকেও তাতে নিষ্ণাত করার প্রেরণা দিচ্ছি। মহাপ্রভুই বার বার বলেছেন, 'যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।'

মৃত্যুর সংকীর্ণ প্রবেশ পথ

প্রত্যেক প্রাণীই প্রতিদিন মৃত্যুর দিকে চলেছে। এইটি সারা বিশ্বের যাবতীয় সংবাদের শেষ কথা। যদি সমস্যা কিছু থাকে, তবে এইটাই যে, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। এ চলার বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই। যদি বিপদ বলে কিছু থাকে, তবে এইটাই সবচেয়ে বড় বিপদ্। সুতরাং আর যত কিছু আলোচনা অবান্তর যদি এই মৃত্যুপথের যাত্রাকে প্রতিরোধ করা না যায়। পৃথিবীতে এইটিই একমাত্র সমস্যা। তাই মহাপ্রভুর আদেশ — যাও সকলকে কৃষ্ণকথা শুনাও। যা কিছু কর না কেন কেবল 'কৃষ্ণ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ'— এই নামই মুখে বলতে থাক। তাহলেই তুমি নিজেও রক্ষা পাবে অন্যকে রক্ষা করতে পারবে। যেখানে যাকে দেখ, কেবল কৃষ্ণ কথাই বল, আর সব কথা অকারণ, অপ্রয়োজনীয়।

মহাপ্রভু বলেন, এটা আমার আদেশ। এটা ভেবে ভয় পেওনা যে, তুমি গুরুর আসন গ্রহণ করলে তোমাকে লোকে ভক্তি করবে, তাতে তুমি কৃষ্ণকে ভুলে যাবে বা অহংকারী হয়ে নরকে যাবে। না না না, আমি আদেশ দিচ্ছি। সেবার কাজ তোমার রয়েছে, তা তুমি করে যাও, বাকী সব দায়িত্ব আমার। সারা জগৎটা মরতে চলেছে, তাদের উদ্ধার করা আমার কাজ, তা তোমাকে দিয়েই করাচ্ছি। তুমি কৃষ্ণকথা বিতরণ করে যাও। আমার আদেশ পালন দ্বারাই তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার সাথীরূপে আমাকে সঙ্গে পাবে।

জড় জগতে, মর জগতে কোনটা রিলিফ ওয়ার্ক — উদ্ধার কার্য্য? কি উপায় দ্বারা এদের উদ্ধার করা যাবে? লোকের প্রকৃত উপকারটা কি? কিছু খেতে দেওয়া, পরতে দেওয়া? এর কোনটাই নয়। তাদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করাই সবচেয়ে বড় কাজ।

আমি মাদ্রাজ মঠে ছিলাম, তখন একজন এসে আমাদের সমালোচনা করে বল্‌তে লাগলেন, "লোকে না খেয়ে মরছে, আর আপনারা কেবল কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলতে বলছেন। দেখুন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা লোকের মুখে আহার দিয়ে তাদের সেবা করছে। যে লোকটা খেতে না পেয়ে ক্ষুধায় ছটফট্ করছে; তাকে আগে খেতে দিন। সে যদি না খেয়ে মরে যায়, তবে আপনার কথা শুনবে কে? আগে তাদের খেয়ে বাঁচতে দিন, তার পরে কৃষ্ণকথা বলবেন।"

আমি তাকে বললাম, "ধরুন, একটা দুর্ভিক্ষ হয়েছে। আমার কাছে কিছু খাদ্য আছে। আমি তাদের বিতরণ করছি। আমার সাম্‌নে বিরাট ক্ষুধাতুর জনতা। যদি কেউ সেখান থেকে চলে যায়, তবে আমি কি তার পেছনে খাদ্য নিয়ে দৌড়াব, না যারা সামনে আছে তাদের দেব?" তিনি বললেন, "যারা আপনার কাছে আছে, তাদের দেবেন, এইটাই ত' সাধারণ কথা।" আমি তাঁকে বললাম, "আমার কাছে যারা আছে, তাদের কৃষ্ণকথা না বলে একজনের পেছনে দৌড়ে সময় নষ্ট করব কেন? এত লোক আমার কাছ থেকে কৃষ্ণকথা শুনতে চাইছে। আমি তাদের কাছে কৃষ্ণকথামৃত বিতরণ না করে একজনের পেছনে দৌড়াবার বোকামী করতে চাই না।"

আমরা কৃষ্ণকথা বলে লোকের উপকার করতে চাই। তথাকথিত বিপদ বা অসুবিধার কথা চিন্তা করতে চাই না। কৃষ্ণ কথার বিতরণ সেবায় নিজেকে নিয়োগ করা দরকার আর এই আন্দোলন ও স্পন্দন সৃষ্টিকার্য্য চালিয়ে যাওয়া দরকার।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরী থেকে বৃন্দাবন যাত্রাকালে ঝারিখণ্ডের বনপথে যাওয়ার সময় বাঘ, ভাল্লুক, হস্তী, মৃগ, সব প্রকার বন্য জন্তু তাঁর কাছ থেকে কৃষ্ণনাম শুনে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলে নৃত্য করেছে। এটা কি করে সম্ভব হল? কৃষ্ণকথার, কৃষ্ণনামের এমন একটা শক্তি আছে, যার প্রভাবে বন্যজন্তুরাও আত্ম-সচেতন হয়ে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করে নৃত্য করেছিল। পশু-পক্ষী সকলের মধ্যে পরমাত্মার অনুঅংশ আত্মা বিদ্যমান। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃষ্ণনামকীর্ত্তন দ্বারা যে স্পন্দন তরঙ্গ সৃষ্ট হয়েছিল, তা সেই বন্য জন্তুদের স্থূল শরীর ভেদ করে, তাদের আত্মাকে স্পর্শ করেছিল, তাকে জাগিয়ে তুলে আত্মার যে নিত্যস্বরূপ, চিন্ময়ভগবৎ স্বরূপের স্বধর্মে অনুরঞ্জিত করেছিল, ইলেক্ট্রিক কারেন্ট যেমন জড়বস্তুর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে তাকেও তদ্রূপ করে দেয়। সেই রকম শ্রীমহাপ্রভুর উচ্চারিত কৃষ্ণনাম তার চিন্ময় প্রভাব দ্বারা জীবজন্তুর চিন্ময় সত্তাকে জাগ্রত করায় তারা কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করে নৃত্য করেছিল।

কৃষ্ণ নামের স্পন্দন যে কোন জড়বস্তুকেও চিন্ময় বস্তুতে পরিণত করতে পারে। সুতরাং আমরা সর্বত্র কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন প্রচার ও প্রসার করে আমাদের পূর্বগুরুবর্গের আরব্ধ সেবাকার্য্যকে এগিয়ে নিয়ে যাব। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাঁদেরই অভীষ্ট পুরণে ব্রতী হয়ে আমাদের জীবন সার্থক করব। তাতে গুরুসেবা ও কৃষ্ণসেবা, দুইটিই যুগপৎ সাধিত হবে।

অধ্যায়-৭

মন্ত্র-দীক্ষা গুরু

মন্ত্রদীক্ষা গুরু মহাভাগবতোত্তমই হন, বা মধ্যম ভাগবতই হন, তিনি যখনই মন্ত্রদীক্ষা দেন, তখন তিনি মধ্যম-অধিকারী ভূমিকায় এসে তা করে থাকেন। গুরুর কাজ ত' মধ্যম অধিকারীর। যিনি মধ্যম অধিকারী স্তরে উন্নীত হয়েছেন, তিনিও গুরু হয়ে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে থাকেন।

গুরু তিন প্রকার। উত্তম অধিকারী গুরু নিত্য গোলোক ভূমিকা থেকে এই জগতে নেমে আসেন এবং শিষ্যকে সেই ভূমিকায় নিয়ে যেতে পারেন। মধ্যম-অধিকারী গুরু এই জগতেই থাকেন এবং তিনি উচ্চতম ভূমিকায়ও পা ফেলেছেন, তিনিও শিষ্যকে সেই ভূমিকায় নিয়ে যেতে সমর্থ। আর সর্বনিম্ন অধিকারী যিনি, তিনি এই জগতেই আছেন, তিনি পরবর্তী উচ্চতর ভূমিকার দর্শন পেয়েছেন, তিনি শিষ্যকে সেই উন্নততর ভূমিকায় নিয়ে যাওয়ার প্রযত্ন বা সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই যে তিন শ্রেণী অধিকারীর কথা বলা হল, তা ঠিক তিনশ্রেনীর বৈষ্ণব নয়, এটা তিনশ্রেণীর গুরুর কথা বলা হল।

উত্তম-ভাগবত বৈষ্ণব মধ্যম-অধিকারীর ভূমিকায় নেমে এসে আচার্য্য হয়ে থাকেন। তিনি আচরণ করে শিক্ষা দেন। শিষ্যদের বা জগতবাসীর নিকট গুরু অর্থাৎ আচার্য্য গুরুরূপে সকলকে উন্নত ভূমিকায় যাওয়াতে সাহায্য করেন। তার একটি পা কৃষ্ণের লোকে থাকে আর একটি পা এই জগতে থাকে এই আচার্য্যের কাজ করার জন্য। এই কাজটি মধ্যম-অধিকারীর। আর কনিষ্ঠ-অধিকারী, যার এই জগতেই দুটি পা এখনও রয়েছে, অথচ তিনি উচ্চস্তরের দর্শন পেয়েছেন। তিনিও গুরু হয়ে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে শিষ্য গ্রহণ করেন।

এই হল তিনশ্রেণীর আচার্য্য বা গুরুর কথা। বৈষ্ণবের তিন বিভাগের কথা এ নয়। সেটির স্বতন্ত্র বিচার।

ভক্ত তিনপ্রকার

অর্চায়ামেব হরয়ে
পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ ভক্তেষু চান্যেষু
স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥

যে ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত শ্রীবিগ্রহের পূজা করে, কিন্তু বৈষ্ণবভক্তের প্রতি বা অন্যের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে না, সেই ভক্তকে প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্ত বলা যায়।

ঈশ্বরে তদধীনেষু
বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা
যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥

মধ্যম অধিকারী ভক্ত ভগবানের প্রতি প্রেমযুক্ত, ভক্তের প্রতি মৈত্রী, অজ্ঞের প্রতি কৃপা ও শত্রুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের বচন অনুসারে উত্তম তথা মহাভাগবতের লক্ষণ এই প্রকার,—

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্-
ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ
ভাগবতোত্তমঃ ॥

উত্তম ভাগবত সর্বত্র কৃষ্ণের অধিষ্ঠান দর্শন করেন এবং কৃষ্ণের মধ্যে সবকিছু দর্শন করেন। এই হল তিনশ্রেণীর ভক্তের কথা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণনামকীর্ত্তনকারী ভক্তগণের এই প্রকার তিনস্তরের কথা বলেছেন। যে একবার মাত্র কৃষ্ণনাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, সেই তৃতীয় শ্রেণীর ভক্তপদবাচ্য।

আর যে ব্যক্তি সর্বদা শ্রদ্ধার সহিত কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন, তিনি মধ্যম শ্রেণীর ভক্ত বলে গৃহীত। আর সর্বোত্তম অর্থাৎ প্রথমশ্রেণীর ভক্ত এতই শক্তিমান্ যে, তাঁকে দেখলেই কৃষ্ণনাম মুখে আসে। "যাঁহারে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান"। উত্তম বা প্রথমশ্রেণীর ভক্তের এই প্রকার মহিমা।

মধ্যমশ্রেণীর ভক্তের বা বৈষ্ণবের কিছু সংসার-সম্পর্ক রয়েছে, তিনি এই সংসার-সম্পর্ককে নিন্দা করেন এবং পূর্ণভাবে ভগবৎ সম্পর্ক বা অনুভব করে থাকেন। তিনি

পরমার্থ বা ভক্তিরাজ্যে পরিপূর্ণভাবে নিষ্ণাত। তাঁর পূর্ণ ভগবৎ প্রীতি রয়েছে, কিন্তু সংসার নিবৃত্তি সম্পূর্ণ হয় নাই। তথাপি অপরের হিতসাধন করার যে ইচ্ছা তাঁর আছে, তাহা প্রশংসনীয়। তিনি পুরোপুরি সংসারাসক্তি ছাড়তে পারেন নাই। কিন্তু তিনি তা ক্রমশঃ জয় করতে চলেছেন। তিনি কৃষ্ণচেতনার পূর্ণপ্রাপ্তির পথে বাধার পরে বাধা অতিক্রম করতে করতে এগিয়ে চলেছেন।

তাঁর শুভেচ্ছা আছে, তিনি প্রকৃত প্রচারক। তিনি এই সংসার অতিক্রম করে কৃষ্ণের রাজ্যে প্রবেশ করার শেষ সোপানের কাছে এসে গিয়েছেন।

নূতন ভক্ত বা প্রাথমিক ভক্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীবিগ্রহ দর্শনাদি করে, শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ মেনে জীবনযাপন করে, কিন্তু, সংসারের মোহে জড়িয়ে যায়। অপরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বেলায় সে সব সময় শাস্ত্র নির্দিষ্ট বিধি রক্ষা করতে পারে না। শাস্ত্রের বচন তার উপর আংশিক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অন্য ব্যক্তির সঙ্গে তার পারমার্থিক সম্বন্ধ আদৌ না থাকতে পারে।

কিন্তু মধ্যম ভাগবত তার সাধারণ জীবনেও শাস্ত্র নির্দেশ অনুসারে চলবার চেষ্টা করে। শাস্ত্রবাক্য অনুসারে সে কি প্রকার ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুতা করবে তা স্থির করে, জীবিকা বা অর্থোপার্জনের জন্য সে কি প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করবে, সঙ্গী নির্বাচন করবে, তা স্থির করে থাকে।

মায়ার সঙ্গে সংগ্রাম

মধ্যমশ্রেণীর ভক্তের সামাজিক জীবনও শাস্ত্র নির্দ্দেশ অনুসারে নিয়মিত হয়। এই প্রকার জীবন যাপনের প্রণালী অবলম্বন করার জন্য তিনি অন্য ব্যক্তিকেও পরমার্থ বা ভক্তিপথে সাহায্য করার যোগ্যব্যক্তি। তিনি যখন নিজের সাধনপথে যথেষ্ট দৃঢ়তা লাভ করেছেন তখন কোনও জাগতিক আকর্ষণ বা প্রলোভন তাঁকে তাঁর ভক্তিপথ থেকে বিচ্যুত বা স্খলিত করতে পারে না। এই শ্রেণীর ভক্তই মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে শিষ্য গ্রহণ করার যোগ্যব্যক্তি। তিনিই অন্য ব্যক্তিকে সাহায্য করার অধিকারী। কারণ তিনি বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধান এবং অসৎসংস্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার যথেষ্ট শক্তিশালী। মায়ার সঙ্গে সংগ্রাম করে জয় লাভ করার যথেষ্ট যোগ্যতা তাঁর আছে এবং যে কোন অবস্থায়, যে কোন পরিস্থিতিতে নিজের স্বকীয় পরমার্থ ব্যক্তিত্ব বজায় রাখার শক্তি তাঁর আছে। এ শক্তির বহুবার পরীক্ষাও তার জীবনে হয়ে গিয়েছে; তাই এই স্তরের ব্যক্তিই আচার্য্য বা গুরু হওয়ার যোগ্য।

ভক্তের সংজ্ঞা সম্পর্কে শাস্ত্রে আরও কিছু সংকেত আছে। যাঁর শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস আছে, ভক্তি আছে, যিনি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ নিষ্ঠার সহিত জীবনে পালন করেন, যার সামাজিক জীবন, পারিবারিক জীবন শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে পরিচালিত হয়, তিনিই মধ্যম ভাগবত এবং তিনি জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে কৃষ্ণের ইচ্ছায় চালিত হন, যে কোনও পরিস্থিতিতে যিনি কৃষ্ণের সঙ্গে সর্বদা যোগযুক্ত তিনিই উত্তম-ভাগবত। কৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাস ও প্রীতিই তাঁর জীবনের মুখ্য নিয়ামক। তিনি সর্বদা কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের সেবাই করে থাকেন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত।

এই প্রকারে শাস্ত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে ভক্তের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে।

গুরুদর্শন কি করে হয়?

শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরুদেব উত্তম অধিকারী কি? প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে, শিষ্য নিজ দীক্ষাগুরুদেবকে কেবল উত্তম ভাগবত বলে গ্রহণ করবে তা নয়, তদুপরি গুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি বলেই বিচার করবে। গুরুদেব আশ্রয় বিগ্রহের সাক্ষাৎ অবতার, এই বিচারই শিষ্যের একমাত্র শাস্ত্রসম্মত বিচার। মাধুর্য্যরসে গুরুদেব হচ্ছেন শ্রীরাধারাণীর প্রতিনিধি শ্রীরূপমঞ্জরী।

এইভাবে গুরুদেবকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করতে হবে। কৃষ্ণানুশীলনে আমাদের ক্রমোন্নতি স্তরে স্তরে পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তরে শিষ্য গুরুদেবকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলেই বিচার করবে।

'সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ'

তার পরে আর একটু উন্নতপর্যায়ে শিষ্য গুরুদেবকে আশ্রয় বিগ্রহ অর্থাৎ কৃষ্ণের পরা শক্তির প্রতিনিধি বা অবতার বলে বিচার করবে। শেষ পর্যায়ে শিষ্য গুরুদেবকে শ্রীমতী রাধারাণীর অষ্টমঞ্জরীর মধ্যে কোন এক মঞ্জরীরূপে দর্শন করবে। এ হল একান্ত ভজনবিজ্ঞ রসবিশেষের সাধকের দৃষ্টিকোণের উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তনরীতি। মধুররসের মানস সেবাকারী সাধকশিষ্য গুরুদেবকে কোন বিশেষ সেবার অধিকারিনী মঞ্জরীরূপে তাঁর আনুগত্যে কোন একটি বিশেষ রহঃসেবার যোগ্যতা প্রার্থনা করবে। অন্যান্য রস অর্থাৎ দাস্য সখ্য বাৎসল্য প্রভৃতি রসের অধিকারী শিষ্য সেই প্রকার তত্তৎরসের কোন একমুখ্য সেবকের অনুগত বলে নিজের মানস সেবা করে তাতেই সিদ্ধি লালসা করবে। এই প্রকার রসগত ভিন্নতা বা বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি ও কৃষ্ণের অদ্বয়ত্বে পর্য্যবসিত হবে।

অনেকে গুরুর এই শ্রেণীবিভাগ সমর্থন করেন না। তাঁরা বলেন, কেবল মাত্র সর্বোত্তম স্তরের সিদ্ধপুরুষ. যিনি সে জগৎ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনিই গুরু হওয়ার যোগ্য। এই শ্রেণীর গুরুদেবের কাছ থেকেই মন্ত্র গ্রহণ করা উচিত।

আমারও প্রথমে এই প্রকার বিচারই ছিল। কিন্তু পরে তার পরিবর্ত্তন হল এবং আমারও চিন্তাধারা ভিন্ন দিকে চালিত হল। প্রথমে আমি শিষ্য গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলাম না। আমার গুরুদেব শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অপ্রকটের পরে তিনটি ঘটনার পরে আমার বিচার ধারা পরিবর্ত্তিত হল এবং আমি ঐ দায়ীত্ব খুব বিনীত ও নম্রতা সহ স্বীকার করে নিলাম। এই সেদিনও একজন আমাকে এই প্রশ্নই করেছিলেন। তাঁকে আমি কৃষ্ণের মাথাধরা রোগের কথা বলেছিলাম।

কৃষ্ণের মাথাধরা

কৃষ্ণ যখন দ্বারকায় ছিলেন, তখন একদিন তিনি মহর্ষি নারদকে বললেন যে, তার ভীষণ মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে আর তার একমাত্র ঔষধ হচ্ছে কোন ভক্তের পদধূলী।

নারদ দ্বারকার ভক্তগণের নিকট এই সংবাদ দিলে কোন ভক্তই পদধূলী দিতে চাইলেন না। তাঁরা বললেন, "না, না, আমরা স্বয়ং ভগবান্‌কে পদধূলী দিতে পারব না, এটা অসম্ভব, আমরা নরকে যেতে চাই না।"

নারদ নিরাশ হয়ে কৃষ্ণের কাছে ফিরে এলেন। কৃষ্ণ খুব ব্যস্ত হয়ে বললেন, "আমার মাথা যন্ত্রণা ভীষণ বেড়ে গিয়েছে। তুমি কি কোন ভক্তের পদধূলী পেয়েছ? নারদ বললেন,— "না, কেউই দিতে চাইলেন না।" কৃষ্ণ বললেন,— "তুমি একবার বৃন্দাবনে গিয়ে চেষ্টা কর।"

নারদ তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবনে গিয়ে গোপীদের এ সংবাদ দিলেন এবং ভক্তের পদধূলী চাইলেন।

গোপীগণ শুনা মাত্রই বললেন, — "কৃষ্ণ অসুস্থ! তিনি আমাদের পদধূলী চান? নারদ! তুমি আমাদের পদধূলী নিয়ে তাড়াতাড়ি যাও।" নারদ স্তম্ভীত হয়ে গেলেন। "কি ব্যাপার! কোন্ ভক্ত কখন নিজের পদধূলী কৃষ্ণকে দিতে পারে?" তিনি গোপীদের বললেন,— "তোমরা জান, এতে অপরাধ হয়?" গোপীগণ বললেন, "হাঁ, তা ত' জানি, এতে অনন্তকাল নরকে যেতে হয়। আমরা তার জন্য এতটুকুও চিন্তিত নই। কৃষ্ণ যদি একটু সুস্থ হন, তাই আমাদের চিন্তা।"

এই একটি কথা তখন আমার মনে এসেছিল। আর একটি মনে এল, মহাপ্রভুর আদেশ —

"আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ"

— আমার আদেশ, "গুরু হয়ে যাও আর দেশকে উদ্ধার কর।"

তাই আমাদের বিচারধারা হবে, আমি খুবই নগণ্য হতে পারি, কিন্তু আমার গুরু আমাকে যা দিয়েছেন, তা ত' অসামান্য, খুবই প্রয়োজনীয় আর অমৃত। আর তিনিই আমাকে তা অপরকে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন।

তাই এতে ভাববার কি আছে? আমি সে ঝুঁকি নেবই। তিনিই ত' আদেশ করেছেন। আমি তাঁরই সেবক। তিনি আমার ভালমন্দ দেখবেন। এই প্রকার মনোভাব নিয়ে শিষ্য-ভক্ত নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব, কর্ত্তব্য করে যাবে আর চিন্তা করবে— "আমি না হয় নরকে যাই যাব। কিন্তু আমার গুরুর আদেশ আমি পালন করব।"

এই ভাবে যদি শিষ্য-ভক্ত কাজ করে যায়, তবে তার কোন অনিষ্টই হবে না। আর যদি সে অন্যাভিলাষী হয়ে পথভ্রষ্ট হয় এবং জাগতিক লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার পেছনে ছুটে তবে তার পতন অনিবার্য্য। তা না হলে কোন অমঙ্গল তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

রামানুজাচার্য্যের গোপনমন্ত্র

শ্রীরামানুজাচার্য্যের জীবনে এই প্রকার একটা ঘটনা হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের একজন আলওয়ার গুরু একটা শ্রেষ্ঠ মন্ত্রের অধিকারী ছিলেন। রামানুজাচার্য্য তাঁর কাছ থেকে সেই মন্ত্রটি নিতে চাইলেন। আলওয়ার গুরু বললেন, "আপনি যদি এই মন্ত্রটি গোপনীয় রাখেন কারও কাছে প্রকাশ না করেন, তবে দিতে পারি।"

রামানুজাচার্য্য তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হলেন যে, তিনি ঐ মন্ত্র অন্য কাউকে দিবেন না। তখন গুরু তাঁকে মন্ত্র দিলেন। এর মধ্যে বহু ব্যক্তি একথা শুনেছিলেন এবং বাইরে অপেক্ষা করেছিলেন। রামানুজাচার্য্য মন্ত্র নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলে সমবেত ভক্তরা তাঁকে ঘিরে ফেলে জিজ্ঞাসা করল, "আমরা শুনলাম, আপনি যে মন্ত্র গ্রহণ করেছেন,তা সকলকে মুক্তি দিতে পারে।"

রামানুজ বললেন, হ্যাঁ ঠিকই আমি যে মন্ত্র পেয়েছি, তা সকলকে মুক্তি দিতে পারে। তখন তারা জানতে চাইল, সেই মন্ত্রটি কি? তখন রামানুজ সকলের সম্মুখে মন্ত্রটি বলে দিলেন। একথা শুনে গুরুদেব রেগে গিয়ে বললেন,— তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে, তার

শাস্তি কি জান? রামানুজ বললেন, "হাঁ জানি আমার অনন্ত নরক প্রাপ্তি নিশ্চিত। কিন্তু আপনার মন্ত্র ত' শক্তিশালী। তা এইসব সাধকগণকে মুক্তি দান করবে। তাতে নরকে যাই যাব, আপত্তি নাই।"

যদি আমরা এই প্রকার রিস্ক' নিতে পারি, তবে গুরুই রক্ষা করবেন। আমাদের কোন অমঙ্গল হবে না। সর্বদর্শী ভগবান্ আছেন, আমাদিগের কোন অমঙ্গল হতে পারে না। তাঁরা ত' চিন্তা করবেন, এ ব্যক্তি আমাদের জন্য অপরের মঙ্গলের জন্য নরকে যেতেও প্রস্তুত। তাঁরা কি স্থির থাকতে পারেন? তাঁরা ত' মৃত নন।

আমরা যদি এতটা নিঃস্বার্থ হতে পারি, তখন আমরা চিন্তা করব, আমি বরং নরকে যাই, গুরুদেবের আদেশ আমি পালন করব, তাঁর ইচ্ছা আমার মাধ্যমে ক্রিয়াশীল হবে। এই প্রকার চিন্তাধারা থাকলে মন্ত্র দিয়ে আচার্য্যের কাজে যথেষ্ট বল পাওয়া যাবে। আমি যদি বিশ্বাস করি যে এই ঔষধ আমাকে ভাল করছে, আমি সেরে উঠছি, তবে সেই ঔষধ ঐ প্রকার আমার মত রোগীকে আমি দেওয়াতে ত' সুবিধাই হয়।

জীব গোস্বামী জ্ঞানশাঠ্য ও বিত্তশাঠ্য বলে দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমার কাছে অর্থ আছে, আর দেখছি আর একজন আমার সামনে অর্থের অভাবে যথেষ্ট কষ্ট পাচ্ছে। আমি যদি টাকা রেখে বসে থাকি, আর ঐ ব্যক্তি অর্থাভাবে উপবাস করে, তবে তার কষ্টের জন্য আমিও দায়ী হব। সেই রকম আমার কিছু জ্ঞান আছে আর একজন অজ্ঞতার দরুণ কষ্ট পাচ্ছে, আমি যদি তাকে সাহায্য না করি তবে আমি সমাজের বিচারে একজন অপরাধী।

এক সময় আমি একজন ডাক্তারকে বললাম, "আপনি কি রোগ সম্পর্কে ভালভাবে জানেন? তবে ঐ রোগীকে চিকিৎসা করতে ভয় পাচ্ছেন কেন। তা হলে আপনার ডাক্তারী সম্পর্কে অল্প জানা আছে, ঐ প্রকার চিকিৎসা করা ভাল নয়।"

তারপরে আমি নিজেই চিন্তা করলাম, সত্যিই ত' খুব ভাল ডাক্তার ত' সর্বত্র পাওয়া যায় না। আর সব ডাক্তারই যে পুরো অভিজ্ঞ, তাও নয়। তবে যেখানে ঐ অল্পজানা ডাক্তার চিকিৎসা না করেন, তবে ত' খুবই মুস্কিল হবে। তাই যেখানে অভিজ্ঞ লোকের অভাব, সেখানে অল্প কিছু জানা লোকও যতটা পারে অপরকে সাহায্য করবে।

তাই সরল বিশ্বাসে আমরা যতটুকু পারি অপরকে সাহায্য করব। ঐ অবস্থায় আমরা আচার্য্যের দায়িত্ব নিতে দ্বিধা করব না। কিন্তু যদি কোন সময় আমি আমার চেয়ে উন্নত স্তরের গুরুপাই, তখন যাদের আমি এযাবৎ সাহায্য করছি, তাদের ঐ উন্নত গুরুকে আশ্রয় করা কাজে আমরা বাধা ত' দেবই না বরং সাহায্য করব। হরিভক্তিবিলাসে এও

বলা আছে, যদি উন্নতস্তরের গুরু বিদ্যমান থাকেন,তখন নিম্নস্তরের সাধকগণ শিষ্য গ্রহণ করবে না।

ধরুন একজন চাষীর উর্বর জমি রয়েছে আর তার কাছে দুরকমের বীজ রয়েছে, তা হলে সে প্রথমে ভাল বীজটাই বুনবে, তাতে ফসলও ভাল পাবে। যদি কোন কারণে ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তবে ভাল বীজের বদলে অন্য সাধারণ বীজ ব্যবহার করবে। কিছু ত' পাবেই। সেই রকম উন্নত গুরু যদি থাকেন তবে সেখানে নিম্নস্তরের গুরু তাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

কিন্তু প্রত্যেক শুদ্ধ ভক্তই ত' নিজেকে তৃণ থেকেও নীচ বলে মনে করেন। তাই তিনি ত' সর্বদাই শিষ্য হওয়ার জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিকে উচ্চস্তরের গুরুর কাছে নিয়ে যেতে চাইবেন। এ প্রকার পরিস্থিতিতে কি করা উচিত— এই প্রশ্নও আসে।

নীচ হতেও নীচ

ভক্তি যত বাড়তে থাকে, ততই ভক্ত নিজেকে নীচ হতেও নীচ বলে মনে করে। কিন্তু যখনই গুরু হওয়ার প্রেরণা তার মধ্যে আসে, তখন কৃষ্ণই তাকে আদেশ দিয়ে থাকেন, "তোমাকে ও কাজ করতেই হবে।" ও ক্ষেত্রে কৃষ্ণই তাকে দিয়ে গুরুর কাজ করিয়ে নিতে চান। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বললেন, "সনাতন ! আমার মধ্য দিয়েই কৃষ্ণকৃপা তোমার উপর বর্ষিত হচ্ছে। যদিও কৃষ্ণকৃপা আমার মধ্য দিয়েই তোমার কাছে যাচ্ছে, আমি কিন্তু এই সব শব্দের কোন অর্থই বুঝতে পারছি না, আমি আমার আচার্য্যের আদেশই পালন করছি।

আমি যত ক্ষুদ্রই হই না কেন, আমাকে আমার গুরুর আদেশ পালন করতেই হবে। এই প্রকার বিচারধারা নিয়েই আমি আচার্য্যের কাজ করে যাব।

এত কেবল বাইরের আদেশই নয়, কিন্তু অন্তরে প্রেরণাও আছে। আচার্য্য আমাদের নির্দ্দেশ দিয়েছেন, "তোমরা প্রচার করে যাও। তোমরা তার অধিকারী ও যোগ্য। তোমরা যদি তা না কর, তবে তোমাদিগকে আমি কেনই বা দিয়েছি। আমি যেমন তা প্রচার করছি, তোমরাও তাই করবে। যদি কেউ অন্তরে এই প্রকার প্রেরণা অনুভব করে, সে নিশ্চয় করবে। আমরা যদি এই ভাবে সমাজের সেবা না করি, তবে আমাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটি হবেই। আমরা গুরুর কাছে যা পেয়েছি, তা যদি অন্যকে বিতরণ না করি, তবে গুরুই ত' আমাদের বলতে পারেন, "তোমাদের যা দিয়েছি, তা ত' তোমার মধ্যে তালাচাবি দিয়ে রেখে দিতে বলি নাই। তা বিলিয়ে দিতে বলেছি।"

তবে অসুবিধাও আছে। গুরু হওয়া, গুরুর আসন গ্রহণ করা, গুরুর সম্মান গ্রহণ করা এক কথা, আর কর্ত্তব্য করা আর এক কথা। সততা ও আন্তরিকতাই মুখ্য। এটা অবশ্য খুব কষ্টসাধ্য এতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি একজন অকৃতকার্য্য হয়, তবে সেও যাবে, তার সঙ্গে অন্যেরাও যাবে।

যে ব্যক্তি নিজে কপট, সে অপরকেও ঠকাবে। তাই আমরা গুরুর কাছ থেকে যা পেয়েছি, সে সম্পর্কে খুবই সাবধান হওয়া দরকার। আবার আমরা সেই কর্ত্তব্য সম্পাদনে যোগ্য কি না, আমরা সত্যিই অপরের ভাল করতে পারি কি না, তা ত' চিন্তা করা দরকার।

শ্রীগুরুর শিক্ষায় শ্রীগুরু লাভ

মন্ত্রদীক্ষা না দিয়েও অন্যকে পারমার্থিক পথ দেখান যায়। মন্ত্রদীক্ষা দেওয়ার কি প্রয়োজন? নিজের গুরু থেকে যে উপদেশ পেয়েছে, তা অন্যকে বলা যেতে পারে? এ প্রকার প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক।

গুরুকে লাভ করার এও একটা কৌশল। তোমরা যে ব্যক্তিকে ভক্তিপথের উপদেশ দিলে। তিনি যদি বলেন, আমি যখন আপনার উপদেশ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছি, তখন আমার অন্য কারো কাছে যাওয়া দরকার নাই। আমি যেতে চাইও না। আমি আপনার কাছ থেকে যা শুনছি, কেবল তাই গ্রহণ করব। আপনি ছাড়া আমি অন্য কাউকে গুরু বলে স্বীকার করতে চাই না।

তার উত্তরে বলা যেতে পারে, যখন তুমি আমাকে ভক্তি কর, তবে আমি যখন আদেশ করছি অন্যকে গুরুবলে স্বীকার করতে তাতে আমারই সন্তোষ বিধান হবে। এটা সম্ভব, যখন তিনি বাস্তবিক বিশ্বাস করেন যে, অন্য ব্যক্তি তাঁর চেয়ে উন্নত। কিন্তু তিনি যখন দেখবেন যে, কোন গুরু অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হয়ে পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই নিজের অনুরক্ত শিষ্যকে ঐ ভ্রষ্টগুরুর কাছে যাওয়ার জন্য প্রেরণা দিতে চাইবেন না। তখন নিজেই শিষ্যের সমস্ত দায়িত্ববহন করবেন। এ সব ত' পরমার্থ অনুভূতির ব্যাপার।

অধ্যায়-৮

গুরু বিরহ

শাস্ত্রে গুরুদেবের অপ্রকট সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। শিষ্য ঠিক একটি পদ্মের মত আর গুরুদেব সেই পদ্মকে ঘিরে থাকা জলরাশি, যা পুষ্করিণীতে সচরাচর দেখা যায়।

স্বধামপ্রাপ্ত গুরুদেব ঐ জলের মত এবং কৃষ্ণ হলেন সূর্য্য। পদ্ম যতক্ষণ পর্যন্ত জলের মধ্যে থাকে, সূর্য্য ততক্ষণ পর্যন্ত সেই পদ্মকে প্রফুল্লিত করে, কিন্তু যদি জল না থাকে, তবে সেই সূর্য্যের কিরণ ঐ পদ্মকে পুড়িয়ে ফেলে। গুরুর সাহায্য ব্যতীত শিষ্যের অন্য কোন গতিই নাই।

গুরু ব্যতীত সব শূন্য

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলেছেন, "গুরুদেবের অবর্ত্তমানে কৃষ্ণের অভিন্ন শ্রীগোবর্দ্ধন পর্বতও আমার পক্ষে যেন এক অজগর সর্পসদৃশ আমাকে যেন গ্রাস করতে আসছে, আর রাধাকুণ্ড যেটি সর্বশ্রেষ্ঠ লীলাস্থলী, সেও যেন ব্যাঘ্রের মুখের মত আমাকে গ্রাস করতে আসছে। আমার পরমশ্রেষ্ঠ গুরুদেব, যিনি আমাকে প্রাণাধিক ভাল বাসেন, তাঁর বিরহে আমার কাছে সবই শূন্য মনে হচ্ছে। তাঁর অদর্শনে সবই শেষ হয়ে গিয়েছে।" এই স্তরের বিচ্ছেদবেদনা একজন স্নিগ্ধ শিষ্য অনুভব করেন, যখন তাঁর গুরুদেব তাঁর চোখের অন্তরালে চলে যান।

এক সময় একজন শিষ্যকে বল্‌তে শুনেছি যে, বিপ্রলম্ভই হচ্ছে সর্বোচ্চ অনুভূতি। আমি শুনে খুব তৃপ্তি পেলাম, সত্যিই ত' বিরহ বা বিপ্রলম্ভই চরম সিদ্ধি। কৃষ্ণানুশীলনে এই বিচ্ছেদবেদনাই শেষ কথা। এই বিরহের মধ্য দিয়েই আমরা মিলনের চরম আস্বাদন পাই।

"মিলনে সা একা বিরহে তু তন্ময়ং জগৎ।" মিলনে প্রিয়তমকে একাই পাওয়া যায়। কিন্তু বিরহে সর্বত্রই তাঁকে দেখা যায়। তাই রূপানুগ সম্প্রদায়ে বিপ্রলম্ভ বা বিরহের তীব্র বেদনা বোধই চরম প্রাপ্তি।

অভীষ্ট গুরুদেব যখন অপ্রকট হ্য়ে যান, তখন তাঁর পরে যারা গুরুর আসন গ্রহণ করেন, তাঁদের পরস্পর এবং অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক কি প্রকার হওয়া উচিত এ প্রশ্ন অনেকের মধ্যে আসা স্বাভাবিক।

শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরুদেবই সর্বোচ্চ। আচার্য্যেরও শিষ্যগণের উপর সর্বাঙ্গ কর্ত্তৃত্ব। কিন্তু তাই বলে আচার্য্যের পক্ষে কর্ত্তৃত্ব জাহির করতে অন্ধ বা উন্মত্ত হওয়া উচিত নয়। কর্ত্তৃত্বাভিমানের মধ্যে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, যশ প্রভৃতি রয়েছে।

আর এক দিকও আছে। যখন আচার্য্য তাঁর শিষ্যগণের প্রতি বাৎসল্য রসে উদ্‌বুদ্ধ হন, তখন তিনি তাঁদের অভিভাবকরূপে নিজেকে বিচার করেন। তাই অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কিছুটা শিথিল হয়ে যায়, তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই শিষ্যদের প্রতি বেশী অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং নিজের গুরুভ্রাতাদের অবহেলা প্রদর্শন করেন। এ প্রকার চিত্তবৃত্তি নিশ্চয়ই আসে এবং তাঁর পক্ষে ভারসাম্য বজায় রাখা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ভাইরা অবহেলিত এবং পুত্ররা আদর পাওয়া— এই আর কি। তখন গুরু পক্ষপাতী হয়ে পড়েন। তাতে তাঁর শিষ্যরাই স্বাধীনতা পেয়ে কর্ত্তৃত্ব জাহির করে। এ পরিস্থিতিতে আচার্য্য বা গুরু নিজের পবিত্রতা রক্ষা করতে অক্ষম হন এবং এই প্রকার প্রলোভনের দরুণ তাঁর পতন অনিবার্য্য হয়ে দাঁড়ায়।

গুরু সর্বেসর্বা

ডেমোক্র্যাসি আর অটোক্র্যাসি একত্র থাকে না। ভক্তিরাজ্যে অটোক্র্যসিই কাম্য। গুরুই সর্বেসর্বা, গুরুর নিকট নিঃসর্ত্ত আত্মসমর্পণই কাম্য। শিষ্য যখন দেখবে, তাঁর গুরুর কর্ত্তৃত্ব অন্য বৈষ্ণবগণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তখন তার মধ্যে গুরুর প্রতি আনুগত্যও শিথিল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক সে ক্ষেত্রে কৃষ্ণলীলাই আমাদের সমস্যার সমাধান করে। কৃষ্ণ সর্বেশ্বরেশ্বর। কিন্তু মা যশোদা তাঁকে তাড়না করেন, নন্দ মহারাজ তাঁকে নিজের পাদুকা মাথায় রেখে নিয়ে আসতে আদেশ করেন, আর কৃষ্ণও তা সানন্দে পালন করেন। অথচ কৃষ্ণই পরতত্ত্বের চরমসীমা— পরাৎপর পরমেশ্বর পরমব্রহ্ম।

এই বিচারবিবেচনা দ্বারা আমরা গুরুতত্ত্ব সম্পর্কে সমাধান যোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্যের সমন্বয়ের পথ বেছে নিতে পারি।

গুরুতত্ত্ব বিচারে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন প্রয়োজন। প্রত্যেক সন্তানই জানে, তার মাতা সর্বাপেক্ষা স্নেহময়ী। কিন্তু যখন দুটি মাতার তুলনা করা আবশ্যক হয় তখন নিরপেক্ষ মানদণ্ডই প্রযোজ্য। শাস্ত্রে একেই বলে তটস্থ বিচার, স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্যের তুলনাত্মক মানদণ্ড। যখন দুইটির তুলনা হয়, তখন স্বাতন্ত্র্যই বেশী মূল্যবান্।

আচার্য্যের পদবী অত্যন্ত জটিল। আচার্য্যকে নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে আনা খুবই কষ্টকর। এটা বাস্তবজীবনে উপলব্ধি করা যায়। আচার্য্যের প্রভুর শিষ্যের প্রতি সম্পর্ক মাতা ও সন্তান, স্বামী ও স্ত্রী, পিতা ও পুত্র সম্পর্কের মত। গুরু নিজের গুরুভ্রাতাদের বেলায় পরতন্ত্র, কিন্তু শিষ্যের বেলায় তিনি স্বতন্ত্র। তাই পরতন্ত্র ও স্বতন্ত্র (Relative and Absolute) বিচার খুবই কঠিন। এ একটি চিরন্তন সমস্যা।

কৃষ্ণের লীলাতেও ঐ একই সমস্যা। মাধুর্য্য ও বাৎসল্য রসের মধ্যেও বিরোধ। কিন্তু যখন কৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্য বিচার আসে, তখন উভয় রসই তার অন্তর্গর্ভিত হয়ে থাকে।

গুরু ভগবানের চেয়েও বেশী

শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরুই সব, এমন কি তিনি ভগবানের চেয়েও বড়। শাস্ত্র ত' তাই বলে। ভগবানের চেয়েও গুরু আমাদের প্রিয়তম জন। ভগবানের কাজ অনেক। কিন্তু গুরু ত' কেবল আমার কথাই চিন্তা করেন। তাই ভগবানের চেয়ে গুরুই শিষ্যের মঙ্গলের জন্য বেশী দরকার। শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি গুরুভক্তি ও পরমার্থ সিদ্ধির স্বাভাবিক বিকাশ অভিপ্রেত হয়, তবে শিষ্য হৃদয়ে উপরোক্ত বিচারধারার প্রবেশ একান্ত অপরিহার্য্য, তা না হলে শিষ্যত্বই বৃথা হয়ে যায়।

নিয়মটাই সব নয়। যদি সমাজের আইনকানুন হৃদয়ের দিব্য সূক্ষ্মবৃত্তি গুলিকে বিচারের মধ্যে না আনতে পারে, তবে সেই আইনকানুন বৃথা। আইন ত' বিশ্বাসকে পুষ্ট করবে। শাস্ত্রের জুরিসডিক্‌সন্ বা ক্ষেত্রাধিকার সীমিত। প্রেমকে পরিপুষ্ট করার জন্য শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের তাৎপর্য্য।

কেবল প্রীতির দ্বারাই সাহজিক ও মুক্ত প্রগতি সম্ভব। এই প্রেমের রাজ্যেই সমন্বিত স্থিতি সম্ভব। শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন, বৈধীভক্তি, শাস্ত্রানুমোদিত আচার বিচার কেবল কিছু দূর পর্যন্ত সহায়ক হতে পারে, তা হৃদয়ে প্রীতি উন্মেষ করিয়ে সরে যাবে। প্রেমের স্বাভাবিক প্রবাহের আরম্ভ হওয়া মাত্র বিধি নিরস্ত হয়ে আসবে। কেবল নিম্নভূমিকারই বিধির উপযোগিতা আছে, কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ ব্যাপারে বিধি কোন বাধা আনবে না, বরং প্রীতি সম্বন্ধকে স্বাধীন গতি করার সহায়ক হবে। স্বাধীনতাই সব চেয়ে মূল্যবান্। এই স্বাধীন সেবাই রাগমার্গ, এবং এইটিই প্রকৃত সেবা। বিধি দ্বারা প্ররোচিত ও পরিচালিত সেবা প্রীতি সেবা নয়। আমাদের চরম সিদ্ধির লক্ষ্য ত' বৃন্দাবন, তাই আমরা স্বাধীন সেবা— প্রীতি সেবাই চাই। স্বাধীনতা বিহীন সেবা সেবাই নয়। বাধ্যতামূলক সেবা সেবাই নয়। প্রেমের সেবাই দরকার। এইজন্য আমরা বেরিয়েছি। আমরা বিধিমার্গের

সাধন করতে আসিনাই। কিন্তু যার জন্য শাস্ত্রবিধির বৈধীমার্গ, সেই রাগানুগা, সেবা যে সর্বোত্তম সেবা, সেই সেবার অভিলাষী হয়ে আমরা বেরিয়েছি। বিধি ত' রাগেরই পোষক। যারা নূতন করে এই পথে আসছে, তাঁদের কোমল শ্রদ্ধা, এইসব উন্নত বিচার দ্বারা যেন ব্যাহত না হয়, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার।

সাহজিক শ্রদ্ধার দেবদূত

কোন বিধিই গুরু বা আচার্য্যকে বাঁধতে পারে না। শিষ্যের শ্রদ্ধাই সব করতে পারে; বাকী সবগুলি কেবল একটি যন্ত্রমাত্র হবে। শ্রদ্ধা ব্যতীত সবই জড়পদার্থ হয়ে যাবে। আমরা ঈশ্বরের প্রতি নিষ্কপট শ্রদ্ধা উদ্রেক করবার জন্য প্রেরিত ভগবৎ-দূতের ভূমিকা নির্বাহ করছি। জীবের হৃদয়ে শ্রদ্ধার বীজ বপন করা তার অঙ্কুরোদ্‌গম করা এবং তাকে পরিস্ফুট করাই আমাদের কাজ।

এই শ্রদ্ধারূপী ভক্তিলতাকে বিধির আইন কানুন দ্বারা খর্বকরা উচিত নয়। হৃদয়ের সহজ শ্রদ্ধা-প্রীতির প্রবাহ যাতে অবাধে প্রবহমান থাকে, সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলন, হৃদয়ের আন্দোলন, মস্তিষ্কের নয়। আমাদের এই কথাটি সর্বদা মনে রাখা দরকার। সহজ প্রীতি ও সহজ শ্রদ্ধা নিয়েই আমরা সংসার ছেড়ে মঠে এসেছি। অভিপ্রায়ের এই পবিত্রতা সর্বাবস্থায় নিখুঁত থাকা দরকার। বিধি-বিধান তাতে কিছুটা সাহায্য করে, সন্দেহ নাই, কিন্তু নিষ্ঠা বৃদ্ধিতে তা যাতে বাধা আনতে না পারে, সে দিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

আমাদের এই নিষ্ঠাই যাতে সবল হয়, পুষ্ট হয় তার যত্ন চাই। মিশনের বা মঠের বাস্তব উদ্দেশ্যকেই গুরুত্ব দিতে হবে। সাধকের মধ্যে সহনশীলতা ও ক্ষমা-সুন্দর ব্যবহারই বিশেষ আবশ্যক। লোকে বলে দাঁত যদি জিভটাকে কাঁমড়ে দেয় তবে কি দাঁতটাকে উপড়ে ফেলতে হবে? তোমরা ত' একটা সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর অংশবিশেষ। তাই তোমাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার এমন হওয়া উচিত যাতে ক্ষমাগুণটি ভুলে যেতে না হয়।

বিধির শাসনের চেয়ে প্রীতির আবেদন অনেক বেশী শক্তিশালী ও ক্রিয়াশীল। বাইরের খোলসটার চাকচিক্যের দরকার নাই। আমরা ত' একমাত্র ভগবানের, সেবক।

আচার্য্যের সামনে দুটি বিপদ আসে— প্রথমটি শিষ্যদের পক্ষপাত। তা হল নিজের শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর বেশী আকর্ষণ। দ্বিতীয়টি হল স্খলন। এই দুটিই আচার্য্যকে নীচে নামায়। আচার্য্যের এই দুটিই প্রধান শত্রু বা অন্তরায়। যাঁরা আচার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ

করবেন, তাঁরা এ দুটি থেকে সাবধান হবেন। আচার্য্যের পদবীটি খুবই বিপদ্‌জনক। এ পদবীতে প্রলোভনের সুযোগ অত্যন্ত বেশী। তাই যিনি আচার্য্যের পদবী গ্রহণ করবেন, তাঁর অন্তর নিষ্ঠা, সংযম, দৃঢ় মনোবল এবং উন্নত স্তরের কৃষ্ণানুশীলনের সূক্ষ্ম রহস্য ভেদ করবার জন্য অদম্য উৎসাহ থাকা চাই; উচ্চতম রসের সেবালালসা থাকা চাই। তা না হলে তিনি তাঁর আসনের মর্য্যদা রক্ষা করতে পারবেন না; তাঁর অধোগতি অবশ্যম্ভাবী । আচার্য্য হওয়া মাত্র তিনি যদি মনে মনে ভাবতে থাকেন, "যা কিছু দেখছি, এসবের প্রভু একমাত্র আমি, আমিই রাজাধিরাজ," এ প্রকার উন্মাদের বিচার তাকে প্রলুব্ধ করতে পারে। এই প্রকার প্রলোভন থেকে মুক্ত না হতে পারলে তিনি অধঃপতিত হয়ে যাবেন।

যে ব্যক্তি একবার ধন জনের প্রভুত্ব মদে মত্ত হয়ে যায়, সে ত' কখনই সেবকপদ রাখতে পারে না। এই প্রভুত্বের অহং শেষে নিজ গুরুকেই আক্রমণ করতে সাহস করে।

আমরা এই প্রকার শোষণ-ভূমিকায় (land of exploatation) ঘুরে মরছি। তাই যথেষ্ট আত্মসমীক্ষা ও সাবধানতা প্রয়োজন। পরমার্থ পথে স্বাস্থ্যের লক্ষণ হল— যে যত উঁচুতে উঠে সে নিজেকে ততই হীন মনে করে। এই দৈন্যবোধই অন্তরে আত্মোন্নতির মানদণ্ড। প্রকৃত আচার্য্য বাহিরে খুব উচ্চ পদবীতে থাকতে পারেন। অন্তরে কিন্তু তিনি ইষ্টদেবের কাছে আর্ত্তি জানাতে থাকেন, "প্রভো! আমিত' কাঙ্গাল, তোমার কৃপা পেলাম না প্রভু! এ অধমে কৃপা কর।"

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা

বৈষ্ণব গুরুর পক্ষে পথভ্রষ্ট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। তথাপি মাঝে মাঝে ঐ প্রকার দুর্ঘটনা দেখা যায়। সাধারণত পতনের তিনটি লক্ষণ দেখা যায়। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার মোহ। প্রথমে সে নিজ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা হারায়, শাস্ত্র ও সাধুবাক্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। পূর্বে সে যে সব শাস্ত্র ও গুরু উপদেশ প্রচার করত, সে গুলি আর তার মধ্যে দেখা যায় না। উন্নত চিন্তা আর তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না।

এজন প্রকৃত সাধু কি না, তা পরীক্ষা করা যায় এই তিনটি যথা কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার প্রতি আগ্রহ। প্রথমেই সে নিজ গুরুকে অস্বীকার করতে আরম্ভ করে, তারপরেই তার প্রচুর অর্থলালসা, অর্থসঞ্চয় দেখা যায়। অর্থকে নিজ সম্প্রদায়ের সেবায়, হরি গুরু বৈষ্ণবসেবায় বিনিয়োগ না করে কেবল অর্থসঞ্চয় করবার স্পৃহা দেখা যায়।

তারপরেই আসে নারীর প্রতি আসক্তি। অবশ্য যশ, প্রতিষ্ঠা, অর্থ, নারী— এসব

ত' যে কোন আচার্য্য গুরুর নিকট আসবেই। কিন্তু তা ত' ভগবৎসেবার জন্য, তার নিজে ভোগ করার জন্য নয়। যদি লক্ষ্য করা যায় যে সে সম্প্রদায়ের সেবায় না লাগিয়ে নিজের ভোগের জন্য লাগাচ্ছে, তা হলে তার কাছ থেকে সাবধান হতে হবে।

প্রথমে হয় ত' সাময়িক ভাবে ঐ সব দেখলেও তাতে ততটা গুরুত্ব না দিয়ে অপেক্ষা করা দরকার। কিন্তু যদি ঐ প্রকার বিচ্যুতি বার বার ঘটতে থাকে, তবে আমাদের সমবিচার ধারাবিশিষ্ট অন্য ভক্তদের সঙ্গে পরামর্শ করে তারপর সমসাময়িক অন্যান্য আচার্য্যদের সঙ্গেও আলোচনা করতে হবে। যখন আমরা দেখব যে, যা প্রথমে সামান্যভাবে বিবেচিত হচ্ছিল, সেই মন্দ আচরণগুলি বিশেষ আকার ধারণ করেছে এবং তার মাত্রা যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে, তখন নিজেকে ও সম্প্রদায়কে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য উপায় স্থির করতে হবে। ঐ রকম পথভ্রষ্ট আচার্য্যের মন্দগুণের সংক্রামক ব্যাধি যাতে আমাদিগকে বা অন্য সরল বিশ্বাসী কোমল শ্রদ্ধ সাধককে পথচ্যুত করতে না পারে, তার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করতে হবে। এ প্রকার দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে ও ইতিহাসে অতীতে দেখা গিয়েছে। তাই আমরা ঘুমিয়ে না থেকে চোখ খুলে পথ বেছে নেব।

পরিত্যাগো বিধীয়তে

এখন প্রশ্ন — ঐ রকম পতিত আচার্য্যের শিষ্য সম্প্রদায়ের কি করতে হবে।

এ পরিস্থিতিতে শিষ্যকে প্রথমে নিরন্তর কৃষ্ণনামকে আশ্রয় করে কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে। হতে পারে, ঐ আচার্য্য কিছু দিন পরে অনুতপ্ত হয়ে আবার স্বীয় গুরুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সৎপথে ফিরে আসতে পারে। তথাপি মহাভারতে উদ্যোগপর্বে (১৭৯।২৫) বলা হয়েছে, —

> গুরোরপ্যবলিপ্তস্য
> কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
> উৎপথপ্রতিপন্নস্য
> পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥

যে গুরু হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অর্থাৎ কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, তা জানতে পারে না, অহংকারী, ভক্তিপথের সশ্রদ্ধ সেবামনোবৃত্তি রহিত, তেমন গুরুকে ত্যাগ করাই বিধি। মহাভারতে ভীষ্ম তাঁর অস্ত্রগুরু পরশুরামকে এ কথা বলে ছিলেন। দ্বাদশ মহাজনের মধ্যে ভীষ্ম অন্যতম।

শ্রীল জীব গোস্বামীও বলেন, সৎপথ ত্যাগী গুরুকে পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু

এমনও হতে পারে, কোন গুরু কৃষ্ণের ইচ্ছায় সাময়িক ভ্রষ্ট হয়ে আবার সৎপথে ফিরে এসেছেন। তাই ঐরূপ ক্ষেত্রে শিষ্যকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। অবশ্য শিষ্যের পক্ষে ঐ রূপ ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থে এসম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। যদি কোন পুত্র পিতাকে অবমাননা করে ঘর ছাড়ে, তখন পিতা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করতে পারে এবং পরে যদি সে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এসে ক্ষমা চায়, তবে সে আবার পুত্র হিসাবে স্বীকৃত হয়ে সম্পত্তির অংশ পায়। সেই রূপ কোন আচার্য গুরু দুরাচারী হয়ে ভক্তিপথ ত্যাগ করে আবার যদি ফিরে আসেন, তবে তিনি আবার কৃপা পেয়ে থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" শ্লোকটি এ প্রসঙ্গে আলোচ্য।

তাই হঠাৎ কোন নিষ্পত্তিতে না পৌঁছে কিছুদিন অপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত। সবকিছু ভেবেচিন্তে করা দরকার।

গুরু এবং গুরুভ্রাতা, আর গুরু ও শিষ্য— এ সব সম্পর্ক খুব সূক্ষ্ম অনুভূতির সহিত বিচার করা দরকার।

কৃষ্ণ যখন কংসের রঙ্গ সভায় প্রবেশ করলেন, তখন বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁকে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখেছিলেন। সেইরূপ কোন আচার্য্য গুরুকে শিষ্য যে দৃষ্টিতে দেখেন, তাঁর গুরুভ্রাতাগণ সেই দৃষ্টিতে দেখেন না, তাঁদের দৃষ্টিকোন ভিন্ন প্রকার। শিষ্য নিজ গুরুদেবকে কৃষ্ণের অভিন্ন বলে দেখেন; কিন্তু অন্য গুরুভ্রাতাগণ ত' তাঁকে কৃষ্ণের অভিন্ন বলে স্বীকার নাও করতে পারেন।

মধুররসে কৃষ্ণ একপ্রকার, কিন্তু বাৎসল্যরসে কৃষ্ণ অন্যপ্রকার। দাস্যরসের ভক্তগণ অন্যভাবে দেখেন। গর্গমুনি আর একপ্রকার দেখেন। যার যেমন ভক্তি, কৃষ্ণ তার কাছে সেই প্রকার।

গুরুভ্রাতারা আচার্য্যকে যেভাবেই দেখুন না কেন, নবাগত শিষ্যদের শ্রদ্ধা যাতে শিথিল না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। কারণ, কোমলশ্রদ্ধ নবাগত শিষ্যসাধকের গুরুভক্তি ও ভক্তিপথে শ্রদ্ধা নষ্ট হলে তার অকল্যাণ হবে। আমার গুরুভ্রাতা আচার্য্যের প্রতি আমার মনে যাই থাকুক না কেন, তাঁর কোমলমতি শিষ্যগণের মনে কোনপ্রকার সন্দেহ ও দ্বিধা প্রবেশ করান উচিত নয়।

কোন আচার্য্য গুরুর বিচ্যুতি ও অধোগতি যদি দেখা দেয়, তার যতই দুঃখ হোক না কেন, কিছু প্রতিকার আবশ্যক। ভগবান আমাদের এ পরিস্থিতিতে রক্ষা করুন, তবে পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, যত দূর পারা যায়, পদমর্য্যাদা রক্ষা করাই দরকার।

আপেক্ষিকতা ও স্বতন্ত্রতা যুগপৎ অবস্থান করে। শিষ্য সম্প্রদায়কে সর্বাবস্থায়ই যতদূর সম্ভব, আনুগত্যের বিচার রাখতেই হবে। আর গুরুভ্রাতারা গুরুতত্ত্বের গৌরব সম্পর্কে জাগ্রত থাকাই কাম্য। আবারও বলি, নবাগত শিষ্যসম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা শিথিল হওয়ার পরিস্থিতিকে গুরুভ্রাতারাই সর্বদা নিরাকরণ করার মনোবৃত্তি রাখতে হবে। যদিও কোন গুরুভ্রাতা মনে করেন যে, আচার্য্য গুরু তাঁর চেয়ে নিম্নস্তরের, তথাপি তিনি তাঁর পদমর্য্যাদার প্রতি অবহিত থাকবেন, কারণ অপর ব্যাক্তি যে আচার্য্যের আসনে আসীন। ছেলে যদি বিচারপতি হয় আর বাপ যদি উকীল হয়, তবে ছেলেকেও বিচারপতির সম্মান দিবেই। এত ঐ আসনের প্রতি সম্মান। মিশনেও এই প্রকার এ্যাড্জাষ্টমেন্ট বা সমাধান দরকার।

যখন উভয়ে একা থাকেন, তখন উভয়ে বন্ধুর মত নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু শিষ্যদের সামনে বা বাহিরে তা চলে না। দরকার হলে কোন জেষ্ঠ্য গুরুভ্রাতা কনিষ্ঠ আচার্য্যগুরুকে চাপড় মারতে পারেন; কিন্তু সর্বসাধারণ বা শিষ্যদের কাছে আচার্য্যের সম্মান দিতেই হবে এতে মিশনের আবহাওয়া শান্ত থাকে।

মর্য্যাদা রক্ষণ হয় সাধুর ভূষণ। মর্য্যাদাপূর্ণ ব্যবহার পরমার্থ সংঘের সম্মান জনসাধারণের মধ্যে উত্তম পরিবেশ সৃষ্টি করে।

ব্যাসোবেত্তি ন বেত্তি বা

শিষ্য সম্প্রদায় আচার্য্য-গুরুকে সর্বোচ্চস্তরের সাধুবলে শ্রদ্ধা করবে, তবে তারা নিজের সম্পর্কে কিরূপ ধারণা করবে— এ প্রশ্ন সাধারণতঃ শিষ্যের মনে উদিত হতে পারে।

শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করলেন। সেই টীকাতে পূর্ব টীকাকারগণের মতের কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। তাই শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা শ্রীধরস্বামী টীকাকে সর্বজনগ্রাহ্য বলে স্বীকার করতে চাইলেন না। শ্রীধর টীকার পরীক্ষা করার প্রস্তাব হল, টীকাকে মহাদেবের মন্দিরে রেখে দেওয়া হল, শিব যদি তার স্বীকৃতি দেন, তবে তারা স্বীকার করবে। তারপরে মন্দিরের ভিতর থেকে পুঁথিটি বাহিরে আনা হলে তাতে নিম্ন শ্লোকটি পাওয়া গেল,—

অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি
ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। ভগবান মহাদেব বলছেন,

আমি ভাগবতের মর্ম জানি, ব্যাসদেবের পুত্র ও শিষ্য শুকদেব ভালভাবে জানেন। আর শ্রীমদ্‌ভাগবতের রচয়িতা ব্যাসদেব নিজে জানতে পারেন বা নাও পারেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বললেন, "কৃষ্ণ তাঁর কৃপা আমার মধ্য দিয়ে তোমাকে বিতরণ করছেন। আমি বাতুলের মত তোমাকে বলে চলেছি। আমি বুঝতে পারছি, অনেক তত্ত্ব আমার মধ্য দিয়ে তোমার কাছে পৌঁছাচ্ছে, কিন্তু আমি নিজে তা জানি বলে মনে হয় না।"

এটা সম্ভব, এটা বিস্ময়জনক। কিন্তু আমরা ত' তা দেখছি। এটা অযৌক্তিক নয় যদিও তা বোঝা যায় না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় ডালহৌসি স্কোয়ারে একটা সরকারী পোষ্টার প্রায়ই দেখা যেত। একটা দেওয়ালে সৈনিকের ইউনিফর্ম আঁকা হয়েছিল, তার নীচে লেখাছিল, "এই ইউনিফর্মটী পর, আর সেই ইউনিফর্মই বলে দেবে— তোমার কি করা উচিত।"

তাই যখন একজন একটি বিশেষ দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছে, তখন সে বুঝতেই পারবে তার পদবীর কর্ত্তব্যটা কি। সে ত' আন্তরিক আগ্রহী ও সরল। তাই ভগবান্ তাকে সাহায্য করবেন। যে নিজেকে সাহায্য করে ভগবান্ তার সহায় হন।

তোমরা যে দায়িত্ব নিয়েছ এবং তা অকস্মাৎ এসেছে; কিন্তু তার অন্তর্নিহিত রহস্য সম্পর্ক রয়েছে। তখন যদি তুমি এগোতে চেষ্টা কর, তবে তোমার প্রতি সাহায্য উপর থেকে আসবে। তিনি ত' প্রতারক নন। তোমার প্রভু তোমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা তুমি আন্তরিক আগ্রহ সহকারে নিয়েছ। তোমার প্রভু ত' প্রবঞ্চক নন। তিনি তাঁর সমগ্র সত্তা দিয়ে তোমাকে সাহায্য করে বলবেন, "এইটি কর, আমি তোমার সহায়, তোমার পেছনে রয়েছি।"

যখন আমরা সকলেই আন্তরিকভাবে আগ্রহী, তখন আমরাও এই সৌভাগ্য পাব।

নাম গুরু ও মন্ত্রগুরু

বৈষ্ণবগুরু প্রথমে শ্রদ্ধালু শিষ্যকে হরিনাম মহামন্ত্র অর্থাৎ ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক নাম জপ করার অধিকার দান করেন। তার পরে শিষ্যের ভজনাগ্রহ দেখে কৃষ্ণমন্ত্রাদি দীক্ষা মন্ত্র দান করেন। বিশেষে দুইটিই এক সঙ্গে হয়। আবার একজন গুরুর নিকট হরিনাম-মহামন্ত্র নেওয়ার পর তার অপ্রকট বা অন্য কারণে অন্য গুরুর নিকট কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা নিয়ে থাকেন। এখন প্রশ্ন হয়, এই দুই গুরুর প্রতি শিষ্যের বিচারধারা কি প্রকার হবে। যিনি হরিনাম দেন আর যিনি মন্ত্রদীক্ষা দেন— এঁদের দুই জনের প্রতি শিষ্যের কি প্রকার পূজ্যবোধ বাঞ্ছনীয়। এই প্রকার দীক্ষার বৈশিষ্ঠ্যও বিচার্য্য।

শিষ্যের দৃষ্টিতে নামপ্রদাতা গুরুর প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপই করা উচিত তার পরেই মন্ত্রদীক্ষা গুরুর স্থান। মন্ত্রদাতা গুরু যদি পূর্বের নাম দাতা গুরুর শিষ্য হন, তবে যে শিষ্য প্রথমে নাম গুরুর কাছে নাম নিয়েছেন, তিনিই সেই শিষ্যের দৃষ্টিতে অধিক, তার পরে মন্ত্রদীক্ষা গুরু এবং অন্যান্য বৈষ্ণবদের স্থান। সকলকেই যথাযথ গৌরবজনক ব্যবহার করা কত্তর্ব্য।

মন্ত্র— বৃহত্তর বৃত্তের অন্তবর্ত্তী বৃত্ত

শ্রীল জীবগোস্বামী বলেছেন, গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে কৃষ্ণ নামই মুখ্যকেন্দ্র। গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে অন্য শব্দও আছে। কিন্তু নামই মুখ্য। কৃষ্ণনামকে বাদ দিলে অন্যসব শব্দই অর্থহীন, মন্ত্রও বৃথা হয়ে যায়। এইটিই শ্রীল জীবগোস্বামী স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। পবিত্র কৃষ্ণনামই সর্বোপরি। কৃষ্ণ নামের পরিবর্ত্তে যদি মহাদেবের নাম রাখা হয় তবে মন্ত্র মহাদেবের কাছেই যাবে। মন্ত্রের মধ্যে নামই মুখ্য কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য এত বেশী যে, গায়ত্রী মন্ত্রও দরকার না হতে পারে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, —

নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্যাং মনাগীক্ষ্যতে।
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক ঃ ॥

কোন প্রকার শাস্ত্র বিহিত সদাচার, বেদ বিহিত ষট্কর্ম এমন কি গায়ত্রী দীক্ষা পর্য্যন্ত

কিছুই প্রয়োজন হয় না, কেবল শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ মাত্রে সবই সম্পন্ন হয়ে যায়।

আমরা মন্ত্র জপকরি কেবল নামভজন করার জন্যই। তা না হলে মন্ত্রের প্রয়োজনই হয় না। নাম ও মন্ত্রের তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য বিচার এইভাবেই শাস্ত্র ও মহাজনগণ করে গিয়েছেন। সাধকের যা কিছু প্রয়োজন সবই নামের মধ্যে পাওয়া যায়।

নাম সর্বপরিপূর্ণ ও পূর্ণতম। আমরা মন্ত্রজপ করি অপরাধ, পাপ, ইত্যাদি নাশ করার জন্য। মন্ত্রের কাজ এই পর্যন্তই।
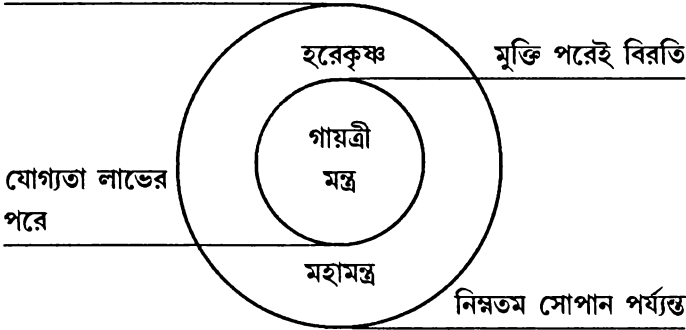
একটি বড় বৃত্ত ও তার মধ্যে ছোট বৃত্ত দিয়ে নাম ও মন্ত্রের স্থিতি বুঝান হয়েছে। কৃষ্ণনামই বড় বৃত্ত। সর্বোচ্চ স্থিতি পর্য্যন্ত তার বিস্তৃতি। ছোট বৃত্তটি মন্ত্রবৃত্ত। মন্ত্র নিম্ন স্থিতি পর্য্যন্ত যেতে পারে না। কিন্তু নাম সর্বনিম্নস্তর পর্য্যন্ত পৌঁছাতে বা নেমে যেতে পারে। মন্ত্র মুক্তির স্তরে পৌঁছে দিয়ে ক্ষান্ত হয়, তার পরে নামই আমাদের উন্নতস্তরে নিয়ে যায়। নাম ও মন্ত্রের সঙ্গে আমাদের এই প্রকার সম্পর্ক।

নাম সর্বনিম্ন স্তর অর্থাৎ চণ্ডাল, যবনকে পর্য্যন্ত ত্রাণ করতে পারে। সকলেই নাম কীর্ত্তন-ভজনের অধিকারী। কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্র সকলে উচ্চারণ করতে পারে না। নিম্নস্তরের ব্যাক্তিগণ গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার সহজে পায় না। তার আগে কতক বিধি-নিষেধ, নিয়ম-কানুন পালন করবার পরেই গায়ত্রী মন্ত্র জপের অধিকার আসে। মন্ত্র জপের ফলে মুক্তির স্তরে গেলে মন্ত্রের কাজ শেষ হয়, তার পরে নামই উন্নতস্তরে নিয়ে চলে। নামও মন্ত্রের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ এইপ্রকার।

অতি নিম্নস্তরের চণ্ডাল যবন প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যাক্তি নাম কীর্তনের অধিকারি। কিছুটা

সংস্কৃত ও উন্নত হলেই গায়ত্রী মন্ত্র জপের যোগ্যতা আসে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে, —

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥

চৈঃ চঃ আদি ৭।৭৩

গায়ত্রী মন্ত্র জন্ম-মৃত্যুর সংসার থেকে মুক্তি দান করে, কৃষ্ণনাম কৃষ্ণচরণে প্রেম প্রাপ্ত করায়।

নামজপ সর্বসিদ্ধির পরেও চলে। এত কেবলমাত্র সম্বোধন। নামজপ কীর্তনের মধ্যে কোন প্রার্থনা নাই, কোন কিছু চাওয়া নাই।

অতএব নামগুরু ও মন্ত্রগুরু এ দুইএর মধ্যে প্রথমে নাম গুরু, তারপরে মন্ত্রগুরু এবং অন্যান্য ভক্তবৈষ্ণবগণের মর্য্যাদা।

ভ্রাতা-গুরু

যে শিষ্য নিজ গুরুভ্রাতা-আচার্য্যের নিকট মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছে, সেই শিষ্য মন্ত্রদীক্ষা গুরুকে গুরুভ্রাতা বা গুরু— কিভাবে ভক্তি করবে, এ প্রশ্ন হয়।

এটি যুগপৎ ও অচিন্ত্য। একও বটে, ভিন্নও বটে। সেই গুরুভ্রাতাকে সাধারণ ভাবে গুরু হিসাবে পূজা করতে হবে। পূর্বের গুরুভ্রাতা সম্বন্ধের চেয়ে বর্ত্তমানে গুরু শিষ্য সম্বন্ধটাই বেশী প্রকট থাকবে, গুরুভ্রাতা সম্বন্ধ অন্তরে থাকবে।

মুক্তির পরে গায়ত্রী মন্ত্র গুরুর কিছু ভূমিকা আছে কি না বিচার্য্য। নামের ফলে কৃষ্ণের লোকে প্রবেশ করলে সেই নিত্যলীলায় সাধককেও লীলার সেবার জন্য অনেক কিছু করতে হয়। তখন নামকীর্ত্তনও পেছনে রয়ে যায়। নাম ত' অন্তরে আছেই কিন্তু সে ভূমিকায় রসের উপযোগী নিত্য সেবক সেবিকার একজনের আনুগত্যে সেবা সম্পন্ন করতে হয়। যেমন সখ্যরসে সুবল, বলদেব প্রভৃতি মুখ্য। সেখানে গুরুর গুরুও থাকেন। প্রত্যেকেই নিজের নিকটতম শ্রেষ্ঠ সেবক-সেবিকার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকেন এবং তদনুযায়ী সেবা সম্পন্ন করেন।

অনেকে দু জন গুরুর প্রতি কি প্রকার অনুগত থাকবে, তা বুঝে উঠতে পারেন না। তার কারণ, তাঁরা বাহ্যিক আকারকেই দেখেন এবং সেই অবস্থায় থাকার জন্য বুঝতে পারেন না। কিন্তু যথেষ্ট উন্নত স্তরে পৌঁছালে তখন আর বুঝতে অসুবিধা হয় না। তখন

গুরু বললে কি বোঝায়, তা তারা বেশ অনুভব ও প্রত্যক্ষ করতে পারেন। তখন সব গুরুই লীলাস্থলীতে সেবক সেবিকা— একথা জানলে আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয় না। তখন সকলেই একটি দিব্যপ্রেম সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যান। সেখানে সকলেই সকলের বন্ধু ও সহযোগী।

আকারে দুই হলেও দুই গুরুই এক এবং অভিন্ন। কারণ দুই এরই ভূমিকা এক। তারা কেহই পরস্পরের প্রতিকূল বা প্রতিপক্ষ নন।

আমরা যে উদ্দেশ্যে কৃষ্ণানুশীলন সংঘের আশ্রয় নিয়েছি, তা ঠিকমত বুঝতে পারলে শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু ও বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুর পরস্পর সম্বন্ধ ধরতে পারা যায়।

আমরা গুরুবর্গের কৃপাপ্রার্থী। তাঁদের কৃপাবিনা আমরা অসহায়। তাঁদের নিকট আমরা চিরঋণী । তাঁরাই আমাদের একমাত্র নিজজন। তাঁরা সকলেই আমাকে কৃষ্ণধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন।

কৃষ্ণ লীলা-পরিকর সহ অবতীর্ণ হন। কিন্তু গুরুর অবতারে তাঁর লীলাসঙ্গী অল্প আসেন, অন্য সকলেই নব-সংগৃহীত শিষ্য সম্প্রদায়।

গুরু স্বয়ং প্রকাশ ও স্বজ্যোতি ভাস্বর

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রথমে গোপীনাথ আচার্য্যের নিকট যুক্তি দিয়ে বললেন যে, শ্রীচৈতন্য অবতার হতে পারেন না। গোপীনাথ বললেন, "তুমি শাস্ত্র জান না"। সার্বভৌম বললেন, "শাস্ত্র বলে, কলিযুগে অবতার নাই, সেইজন্য ভগবান্‌কে ত্রিযুগ বলা হয়।" গোপীনাথ বললেন, "তুমি মনে করেছ তুমি সব শাস্ত্র জান। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতে কলিযুগে অবতারের কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তা কি তুমি দেখেছ? তাঁকে অস্বীকার করতে পার?" সার্বভৌম পরাজিত হয়ে বললেন, "যাও প্রসাদ সেবন কর, তার পরে এসে আমাকে শিক্ষা দিও।"

গোপীনাথ বললেন, "শাস্ত্রপাঠ বা বুদ্ধি দিয়ে ভগবান্‌কে জানা যায় না। তা কেবল তাঁর কৃপা দ্বারাই সম্ভব।"

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।"

সার্বভৌম বললেন, "তুমি কি বলতে চাও, তুমিই শাস্ত্র জান, আর আমি জানি না? তোমার এতে কি যুক্তি আছে? তুমি তাঁকে অবতার বলছ তাই তোমার শাস্ত্রজ্ঞান আছে, আর আমি যেহেতু তাঁকে অবতার বলছি না তাই আমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই? এর কি প্রমাণ আছে।"

তখন গোপীনাথ বললেন, —

"আচার্য্য কহে বস্তুবিষয়ে হয় বস্তুজ্ঞান।
বস্তুতত্ত্বজ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ ॥"

চৈঃ চঃ মধ্য ৬। ৮৯।

আমি কৃপা পেয়েছি, কারণ আমি তাঁকে জানি, আর যেহেতু তুমি তাঁকে অস্বীকার কর, তাই তোমার প্রতি কৃপা হয় নাই। এই তোমার প্রশ্নের উত্তর। আমাদের নিজের অনুভব, অন্তর তৃপ্তি, বস্তু সহিত সম্বন্ধই প্রকৃত প্রমাণ। এর জন্য বাহিরের কোন প্রমাণ দরকার হয় না।

আমাদের গুরুমহারাজ একটি উদাহরণ দিতেন। যদি কোন ব্যক্তি এক অন্ধকার গুহায় জন্মগ্রহণ করে থাকে এবং তাকে কেউ এসে বলে, "চল সূর্য্য দেখবে।" তখন ঐ ব্যক্তি হাতে একটা লন্ঠন নিয়ে বেরোয় আর বলে, "তুমি সূর্য্য দেখাবে, চল যাই।"

"— হ্যাঁ, আমার সঙ্গে এস, তোমার লন্ঠন রেখে দাও। সূর্য্য দেখতে অন্য কোন আলো দরকার হয় না।"

"— তুমি কি আমাকে বোকা বানাতে চাও? আলো না দিলে ত' কিছুই দেখা যায় না।"

তার বন্ধু তখন তাকে জোর করে টেনে বাহিরে এনে বলবে,— "এখন সূর্য্য দেখছ তো?"— "ও, এই সূর্য্য?"

সূর্য্যের আলোতেই সূর্য্য দেখা যায়। সেইরূপ পরতত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হলেই পরতত্ত্বের স্বরূপ দর্শন হয়। এর জন্য হিসাব-নিকাশ, সাক্ষী-প্রমাণ কিছুই দরকার হয় না। নিজের অনুভূতিই জানিয়ে দেয় এইখানেই সূর্য্য, এইখানে কৃষ্ণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে "আত্মা পরিজ্ঞানময়ো"। কৃষ্ণ ত' দূরের কথা জীবের আত্মাও স্বপ্রকাশ।

কেউ বলেন ঈশ্বর আছেন, নিশ্চয়ই আছেন। আবার কেউ বলেন, না ঈশ্বর নাই। কখনও ছিলেন না। এই প্রকার বিতর্ক অনাবশ্যক। এই তর্কের শেষ নাই। যাদের চোখ নাই, অন্ধ তারা সূর্য্য দেখতেই পাবে না। তারা বলবেই— সূর্য্য বলে কিছু নাই।

যারা আত্মা ও পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তারা ত' চিরকালই অস্বীকার করবে।

যাদের সাক্ষাৎ অনুভব আছে। তাদের ও প্রশ্নই আসে না। পেঁচার দল সূর্য্যকে মানবেই না।

"বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান হয় কৃপাতে ...."
"প্রসাদলেশানু গৃহীত এব হি........"

একজন জন্মান্ধ যদি কোনক্রমে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়, তবে সে পারিপার্শ্বিক বস্তুসমূহ দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হবে। যার চোখই নাই সে রূপ রং কিছুই দেখতে পাবে না। যারা দেখে তারা কি করে অস্বীকার করবে যে কিছুই নাই। আমি দেখেছি, আমি অনুভব করছি— ওঃ সৃষ্টি এত সুন্দর! এত উদার! কি করে না বলব? তুমি অন্ধ তুমি দুর্ভাগা তাই তুমি দেখতে পাও না।

কেউ দেখে, কেউ দেখে না কৃষ্ণ যাদের কৃপা করেন, তারাই দেখে তাঁকে, অপরে নয়।

বিশ্বরূপ

কৃষ্ণ শান্তিপ্রস্তাব নিয়ে কুরু সভায় উপস্থিত হলেন। দুর্যোধন মনে করল এই একটা সুবর্ণ সুযোগ এসেছে, আমরা যদি কৃষ্ণকে বন্দী করে রাখি, তবে পাণ্ডবেরা দুঃখে শোকে হার্টফেল করবে। তা হলে আর যুদ্ধও করবার দরকার হবে না। অন্যান্য কৌরবরা দুর্যোধনের এই প্রস্তাব সমর্থন করল এবং দুঃশাসনকে আদেশ দিল, একটা দড়ি এনে কৃষ্ণকে বেঁধে ফেল। দুঃশাসন একটা দড়ি নিয়ে এসে কৃষ্ণকে বাঁধতে চেষ্টা করল। সাত্যকি এটা দেখে খড়্গ নিয়ে দুঃশাসনকে মারতে গেলে কৃষ্ণ তার হাত ধরে এমন বিশ্বরূপ প্রকট করলেন যে দুঃশাসন বোকা বনে গেল। দুঃশাসন দেখল এত কৃষ্ণ কাকে বাঁধি। কৃষ্ণ বিরাট আকার ধারণ করলেন। একদিকে বলদেব, অর্জুন, আর একদিকে মুনি, ঋষি কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করছেন। দুঃশাসন ঘাবড়ে গেল। ভীষ্ম, দ্রোণও কৃষ্ণের স্তুতি করতে আরম্ভ করলেন। সকলেই দেখে বলল, একি? এত আকার, এত মুখ! নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণও স্তুতি করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন। তিনি কিছুই দেখতে পারছিলেন না। কোলাহল শুনে কিছু একটা অদ্ভুত কান্ড ঘটছে বুঝতে পেরে কৃষ্ণকে প্রার্থনা করলেন, প্রভু! আমাকে অন্ততঃ এই মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টিশক্তি দাও, যাতে আমি তোমার বিশ্বরূপ দর্শন করি, তার পরে তুমি তা ফিরিয়ে নিও।"

কৃষ্ণ বললেন, "তোমার অন্ধত্ব ঘুঁচাবার দরকার নাই। আমি বলছি তুমি দেখ।"

কৃষ্ণের কৃপায় অন্ধও দর্শন করতে পারে। তাই স্থূলচক্ষু কৃষ্ণকে দেখতে পায় না। দেখার জন্য দিব্যচক্ষুর প্রয়োজন। কৃষ্ণের কৃপায় ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্ব থাকা সত্ত্বেও দিব্য দৃষ্টি লাভ করে কৃষ্ণ দর্শন করেছিলেন। ভগবানকে দেখবার যোগ্যতা উপর থেকেই আসে। জড় ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা ভগবৎ দর্শন করতে পারি না।

অসীম কে দর্শন করা ত' দূরের কথা আমরা একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব হতে আগত শব্দ শুনতে পারি, তার বেশী হলে শুনতে পারি না। আমরা জানি সূর্য্য-চন্দ্রাদি গ্রহনক্ষত্র আকাশে ঘুরবার সময় প্রচণ্ড শব্দ করে থাকে। কিন্তু আমরা সে শব্দ শুনতে পাই না। সেই প্রকার আলোক তরঙ্গের একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আমরা দেখি। তার অতীত দূরত্বের আলোক দেখতে পারি না। আলোকের মধ্যে রক্তিম বা নীললোহিত বর্ণও আমরা দেখতে পাই না। আমাদের জড় ইন্দ্রিয়গুলির গ্রহণ ক্ষমতা সীমিত।

গুরু ত' শিষ্যকে ভগবানের কাছে ফিরিয়ে নিতে আসেন। কিন্তু যখন তিনি অপ্রকট হয়ে যান, তখন শিষ্য কিভাবে গুরুর সহিত সম্পর্ক রাখবে, এ প্রশ্ন সাধক-শিষ্যের মনে আসে এবং তার সমাধানও প্রয়োজন।

গুরু কে? কেনই বা তিনি গুরু? গুরু, সাধু শাস্ত্র— এরা এক এবং অভিন্ন। আমরা গুরুর আলেখ্য পূজা করি। বাহ্যতঃ ফটো ও মনুষ্যরূপী গুরু ঠিক এক বস্তু নয়। ফটো বাহ্যতঃ কিছুটা গুরুর স্মৃতি-উদ্দীপক। জড় চোখে যে আকারটা দেখি, গুরু কেবল সেইটুকুই নন। গুরুর প্রকৃত পরিচয় তাঁর চিদানন্দঘন চিন্ময় সত্ত্বায়; তাঁর কথায় অর্থাৎ চিন্ময় বাণী মূর্ত্তিতে,— গুরু-স্বরূপ তার উপদেশের মধ্যে, এইটিই কৃষ্ণচেতনা।

কেবল জড় আকারটার উপাসনা ত' প্রতিমা পূজা আইডল ওয়ারসিপ্। 'মনুষ্যের এতগুলো আকার ত' আমার চোখের সামনে আছে, তবে ঐ একটি বিশেষ মনুষ্যাকারটি আমার গুরু কেন?' কারণ তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে আমাকে যোগযুক্ত করার মাধ্যম। এই কথাটিই গুরুত্বের মানদণ্ড।

ধর্মের অরণ্য

পৃথিবীতে এত ধর্ম— এত মত কেন? উদ্ধব, কৃষ্ণকে এই প্রশ্ন করেছিলেন। এত ইজিম্, মতবাদ কেন? এত মত বা ইজিম্ কি আমাকে ভগবানের কাছে নিয়ে যাবে? এত মত সবই এক না কোন তর তম বিচার আছে?

কৃষ্ণ বললেন, সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি ব্রহ্মার হৃদয়ে ধর্মের তত্ত্ব সঞ্চারণ করেছিলাম, তারপর তিনি তাঁর শিষ্যদের দিয়েছিলেন। আবার সেই শিষ্যগণ নিজ নিজ যোগ্যতা

অনুসারে ধর্মের প্রকৃতস্বরূপকে কিছুটা পরিবর্তন করে তাঁদের শিষ্যদের দিলেন। তাঁরাও আরও কিছু বিকৃত করে তাঁদের শিষ্যদের দিলেন। এইভাবে শিষ্য পরম্পরা ক্রমে এবং যুগের প্রভাবে ধর্ম একেবারে বিলুপ্ত প্রায় হয়ে গেল।

তাই ক্রমশঃ এখন মূল ধর্ম নানা মতের মাধ্যমে এক একটা বিকৃত জঙ্গল হয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র। কেউ তপস্যা, কেউ উপবাস, কেউ দান, কেউ ব্রত — এই প্রকার এটা ওটা কত ধর্ম দাঁড়িয়েছে।

ভগবান কৃষ্ণ ধর্মকে পুনরুদ্ধার বা সংস্কার করার জন্য অবতীর্ণ হন।

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত" যখন ধর্ম অত্যন্ত বিকৃত হয়, কৃষ্ণ তখন অবতীর্ণ অথবা নিজের প্রতিনিধিকে বলে পাঠান — "যাও ঠিক কর।"

এই ভাবে ধর্মের মত পার্থক্য থাকবেই। যে প্রকৃত জিজ্ঞাসু, সেই ধর্মের প্রকৃতস্বরূপ বুঝতে পারে এবং রক্ষা পায়। অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তি ভুলপথে চালিত হয়ে অনেক জন্মের পরে মুক্তি পায়। যে ব্যক্তি সদ্গুরুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয় তার বিনাশ নাই।

কৃষ্ণ এই ভাবে উদ্ধবকে ধর্মের কথা বুঝিয়ে ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে এ সব আলোচিত হয়েছে এবং তা খুবই স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। এর মধ্যে অযৌক্তিক বা গোঁড়ামি কিছুই নাই। সৎসাধকের অমঙ্গল হওয়ার সম্ভবনা নাই।

বৃদ্ধা ও মৌলবী

গুরুর উপদেশের প্রকৃত মর্ম সব শিষ্য গ্রহণ করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর গল্প বলা যেতে পারে।

একজন মৌলবী প্রত্যহ কোরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন। শ্রোতাদের মধ্যে একটা বৃদ্ধা এককোনে বসে দৈনিক পাঠ শুনত এবং যতক্ষন পাঠ চলত, ততক্ষন তার চোখের জল তার বুক ভাসিয়ে দিত। মৌলবী সাহেব প্রত্যেক দিন এটি লক্ষ্য করতেন।

একদিন তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন,— "তুমি আমার প্রবচনে কি এমন পাও যে এত অভিভূত হয়ে কাঁদতে থাক? যখনই দেখি, তুমি কেবল কাঁদছ। কি বুঝ তুমি আমার কথা থেকে?

এর উত্তরে বৃদ্ধা বললেন,— "আমার ঘরে একটি মাদী ছাগল ছিল। তারও দাড়ি ঠিক আপনারই মত। সে যখন ঘাস খায় তখন তারও দাড়ি ঘাসের উপর ঠিক আপনার দাড়ির মতই ঘুরে। সে এখন নাই। আমি তাকে খুবই ভালবাসতাম। আপনার বক্তৃতা

কালে তার কথা আমার মনে পড়ে। যতক্ষন আপনার বক্তৃতা শুনি ততক্ষন আমি তার কথা চিন্তা করে কাঁদতে থাকি, আর সেই লোভেই আমি প্রত্যেক দিন আপনার পাঠ শুনতে আসি।"

কৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হলেন, চলেও গেলেন। অনেকেই তাঁকে চিনতেই পারল না।

যীশুর জীবনেও তাই। তাঁর বারজন শিষ্যের মধ্যে জুডাস তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল। যিশু হতাশ হয়ে বলে ছিলেন,— "যে ব্যক্তি আমাকে ধরিয়ে দেবে, সে তোমাদের বারজনের মধ্যেই রয়েছে।"

তাই আমরা একজন মহাপুরুষের কাছে এসেছি বলে আমাদের সবই হয়ে গিয়েছে, আর কিছুই করার নাই, সবই গিলে ফেলেছি, তা নয়।

পরমার্থ পথ এত সহজ নয়। আমরা একটুমাত্র পেয়েছি, তাই আমাদের পুঁজি। আমরা সবই পেয়েছি, এ প্রকার মনোবৃত্তি বিপরীত ভাবধারা। অসীমের সঙ্গে সম্বন্ধ পেতেছি, যত পাই আরও আছে, আরও দূরে নাগাল পাই না। তথাপি আত্মবিশ্বাস এইটুকু যে, যা পেয়েছি তা ত' খাঁটি।

নিউটনকে সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা একবার বললেন,— "আপনি জ্ঞানের শেষসীমায় পৌঁছেছেন।"

নিউটন তখন যে সব বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার করেছিলেন, তাতে তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে, নিউটন 'সর্বজ্ঞ' হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু নিউটন বললেন,— "আমি জানি যে, আমি তোমাদের চেয়ে কিছু বেশী জানি, কিন্তু আমি এও জানি যে, আমি জ্ঞান সাগরের বেলাভূমি থেকে কয়েকটা নুড়ি মাত্র সংগ্রহ করেছি। আমি তোমাদের চেয়ে যে বেশী জানি, তার প্রমাণ হল অনন্ত জ্ঞান সাগরের সামান্য কিছু আমি জেনেছি, অথচ তোমরা বলছ আমি সব জেনে ফেলেছি। আমি জানি জ্ঞানের শেষ নাই। তোমার বল জ্ঞানের শেষ আছে।"

অনন্তের স্বরূপটাই এই। যে ব্যক্তি অনন্ত অসীমতত্ত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে চায়, তার এটি ভাল ভাবে অনুভব করা দরকার যে অসীম অসীমই। তার সীমা কেউ পায় না।

আমরা কেবল তার থেকে একটু আলোককণা মাত্র চাই। গুরুদেব অসীম, তাঁর কথাও অসীম, কারণ তিনি অসীমেরই প্রতিনিধি। তাঁর কাছ থেকে একটু পেয়েই সব পেয়েছি বলে ক্ষান্ত হব না। আমরা শিষ্য চিরকাল শিষ্যই থাকব।

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় গুরুপরম্পরা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

⇩
শ্রীব্রহ্মা
⇩
শ্রীনারদ
⇩
শ্রীব্যাসদেব
⇩
শ্রীমধ্বাচার্য্য
⇩
শ্রীপদ্মনাভ
⇩
শ্রীনৃহরি
⇩
শ্রীমাধব
⇩
শ্রীঅক্ষোভ্য
⇩
শ্রীজয়তীর্থ
⇩
শ্রীজ্ঞানসিন্ধু
⇩
শ্রীদয়ানিধি
⇩
শ্রীবিদ্যানিধি
⇩
শ্রীরাজেন্দ্র
⇩
শ্রীজয়ধর্ম
⇩
শ্রীব্রহ্মন্যতীর্থ
⇩
শ্রীব্যাসতীর্থ
⇩
শ্রীলক্ষ্মীপতি
⇩
শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী
(শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত)
⇩
শ্রীঈশ্বরপুরী
⇩
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু
⇩
শ্রীরূপ, শ্রী সনাতনাদি
⇩
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ
⇩
শ্রীনরোত্তম
⇩
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
⇩
শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ
⇩
শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী
⇩
শ্রীভক্তিবিনোদ
⇩
শ্রীগৌরকিশোর
⇩
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
⇩
শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর, শ্রীভক্তিবেদান্ত স্বামী
⇩
শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ

✸ ✸ ✸

উপদেষ্টা - আচার্য্যবর্গ

আমাদের গুরুপরম্পরায় যে সব আচার্যবর্গের নাম পর পর দেওয়া আছে তাতে মাত্র ৩৮ টি নাম দেওয়া আছে। কিন্তু এই গুরুপ্রণালী পাঁচ হাজার বর্ষব্যাপী তাতে নিশ্চয়ই কিছু কিছু নাম বাদ পড়েছে, এত সম্পূর্ণ নামের তালিকা নয়। গুরু পরম্পরা ত' অবিচ্ছিন্ন হওয়া আশা করা যায়। এই যে আপাতত ঐতিহাসিক ক্রমভঙ্গ দেখা যায়, তাতে শিষ্যের মনে স্বতঃই প্রশ্ন আসে— এ পরম্পরা নির্ভূল কি? অথবা এর অন্যকোন তত্ত্বগত ব্যাখ্যা আছে?

উত্তরে বলা যেতে পারে যে, আমাদের গুরু পরম্পরা গুরুতত্ত্বানুসারী, শরীরধারী ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। এই গুরুপ্রণালী শাস্ত্র-উপদেশক আচার্য্য পরম্পরা।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই গুরুপরম্পরা একটি গীতিতে প্রকাশ করে লিখেছেন,—

"মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য   রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য
রূপানুগ জনের জীবন।"

কৃষ্ণচেতনার সর্বোচ্চ সত্য শিক্ষাগুরু মাধ্যমেই এ পর্য্যন্ত এসেছে। এটি দীক্ষাগুরু পরম্পরা নয়। যাঁরা যে সময় সর্বোত্তম স্তরে পৌঁছেছেন, সেই শিক্ষাগুরুগণেরই নাম এই গুরু পরম্পরায় উল্লেখ করা হয়েছে।

দীক্ষাবিধি একটি অনুষ্ঠান মাত্র। আসল বস্তু হচ্ছে শিক্ষা অর্থাৎ উপদেশ। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু যদি একব্যক্তি হন, সেই শিষ্য অতি সৌভাগ্যবান্। গুরু বা আচার্য্যগণেরও বিভিন্ন স্তর আছে, গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ ত' শাস্ত্রে দেওয়া আছে। দুই যোগ্যতা একত্র হলে ফল ত' আশানুরূপ হবেই।

কৃষ্ণচেতনা যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে আমরা যোগযুক্ত হয়ে যাব।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতায় বিশেষতঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতে কৃষ্ণ বলেছেন, আমার চেতনা আমিই বিস্তার করতে আরম্ভ করে, ক্রমশ তা যুগের প্রভাবে ও শিষ্যপরম্পরা ক্রমে যখন খণ্ডিত

বা বিকৃত হয় তখন আমি অবতীর্ণ হয়ে তার পুনঃ সংস্থাপন করি। পুনশ্চ মিশ্রিত বা বিকৃত হলে আমার নিজের লোককে অবতীর্ণ করিয়ে তার দ্বারা সংস্কার সাধন করি, তাতে আবার কিছু যুগোপযোগী উপাদান যোগ করি।

কৃষ্ণ-চেতনা কি তা বুঝা দরকার। এটি ব্যবসা নয়, কারও মনোপলি নয়। যারা একনিষ্ঠ সাধকশিষ্য, তাঁরা ঠিকই ধরে নিতে পারেন, কোথায় কার কাছে বাস্তব বস্তু কৃষ্ণচেতনার রশ্মিরেখা বিদ্যমান্।

গুরুপরম্পরাতে মাঝে মাঝে ছেদ দেখা যায়। কোন পূর্ব আচার্য্যের পরবর্ত্তী তাঁরই দীক্ষিত শিষ্য আচার্য্যের নাম নাই, তবে এইটাকি পরম্পরা ভঙ্গ নয়?

পারমার্থিক আলোকবর্ষ

কোন জাগতিক সম্বন্ধ আমাদের মধ্যে নাই। কেবল দৈহিক বা রক্ত-মাংসের সম্বন্ধ আমাদের মধ্যে নাই। পারমার্থিক রাজ্যের মাধ্যম কোন রক্ত-মাংসের ব্যক্তি বিশেষ নন।

বিজ্ঞান জগতে আমরা নিউটনের পরবর্ত্তী আচার্য্যরূপে আইনষ্টাইনকেই গ্রহণ করি। কারণ নিউটনের বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার হওয়ার পর সেই তথ্যের পরবর্ত্তী উন্নত তথ্যের আবিষ্কার আইনষ্টাইনের দ্বারাই হয়েছে। এই দুই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের মাঝখানে অনেক বৈজ্ঞানিক আছেন।

বিজ্ঞানের উন্নতি গালিলিও থেকে নিউটন, তারপর আইনষ্টাইন। মাঝে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা ঐ তথ্য ব্যাপারে তত প্রসিদ্ধ নন।

একটি গ্রহ থেকে অন্য এক গ্রহের দূরত্ব পরিমাপ করার সময় মাঝখানের অনেক ছোট ছোট গ্রহকে ধরা হয় না। এই দূরত্ব পরিমাপের সময় মাইল হিসাবে গণনা করা হয় না, আলোকবর্ষই নেওয়া হয়। সেই প্রকার আচার্য্য পরম্পরা স্থির করার সময় একজন প্রসিদ্ধ আচার্য্য থেকে আর এক প্রসিদ্ধ আচার্য্যকেই গ্রহণ করা হয়। মাঝখানে অনেক অপ্রসিদ্ধ আচার্য্যের নাম গ্রহণ করার দরকার হয় না। অনেক প্রসিদ্ধ মহাজন, আচার্য্য, গুরু বা সাধু আছেন, যাঁদের দীক্ষাগুরু কে, তাঁর কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ও শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজীর মধ্যে প্রায় একশত বৎসরের পার্থক্য। এর মধ্যে কোন আচার্য্যের নামোল্লেখ আমাদের গুরুপরম্পরায় করা হয় নাই। তার কারণ, পারমার্থিক ধারা কোন জড় বংশধারার মত নয়। কোন প্রসিদ্ধ গুরুর পরবর্ত্তী শিষ্য, তার শিষ্যদের মধ্যে হয়ত পারমার্থিক ধারা সুপ্ত হয়ে যায়, জড় বিচার প্রবেশ করে। এই ভাবে কিছু বৎসর চলে, পবিত্র পারমার্থিক ধারা অপমিশ্রিত ও বিকৃত হয়ে গেলে তখন ঐ ধারায় ভগবান্ নিজে আসেন বা তাঁর কোন নিজজনকে প্রেরণ করেন।

এইভাবে পারমার্থিক ধারা অব্যাহত রাখতে উপর থেকেই সাহায্য আসে। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন,— "আজ আমি যা তোমাকে বলছি, তা অনেক বৎসর আগে আমি সূর্য্যকে বলেছিলাম। তা এখন আবার কলুষিত হওয়ায় এখন তোমাকে বলছি।

ধর্ম-বিকৃতি

এই জগতে সব যুগেই ধর্মকে জড়ীয় বিচার সংক্রামিত করে, খন্ডিত করে, বিকৃত করে। তখন ভগবান্ তাঁর নিজ জনকে পাঠিয়ে তাকে আবার পুনঃস্থাপনা করেন, পূর্বের স্বাভাবিক অবিকৃত অবস্থায় নিয়ে আসেন। এই জগতে ধর্মের গ্লানি হবে না, এ আশা আমরা করতে পারি না। হওয়াটাই স্বাভাবিক।

এ সব নীতি বাস্তব জীবনে কি করে অনুসরণ করা যায়, তা বুদ্ধিমান গণই বুঝতে পারেন।

ধরা যাক, আমরা কোন দেশের ইতিহাস লিখতে বসেছি। তখন আমরা বিখ্যাত ব্যক্তি বা বংশ ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করি না। পরমার্থ জিজ্ঞাসু যারা, তারা সেই পথের মুখ্য আচার্য্যগণেরই অনুসরণ করেন, তাদের মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করেন এবং সেই ধারাই অনুসরণ করেন।

পারমার্থিক শিষ্য বা গুরুপরম্পরাও সেই প্রকার দৈহিক পরম্পরা নয়। প্রহ্লাদ মহারাজ এত বড় ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর পুত্র বিরোচন বিষ্ণুবিদ্বেষী। আবার সেই বিরোচনপুত্র বলি মহারাজ ভক্ত শিরোমণি। বংশ হোক আর শিষ্যপরম্পরা হোক, বিখ্যাত ব্যক্তিগণই পবিত্র ধারা রক্ষা করেন। বংশ বা শিষ্য উভয় পরম্পরায় মায়া তার শক্তি প্রদর্শন করে পারমার্থিক ধারায় অনেক বিকৃতি ও গ্লানি ঘটায়। তাই বিজ্ঞব্যক্তি সাধু-পরম্পরাই অনুসন্ধান করেন।

কোপরনিক্‌ষ, গ্যালিলিও, নিউটন, আইনষ্টাইন

একজন বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে কোন নূতন তথ্য আবিষ্কার করলেন। আর একজন সেই সূত্র অবলম্বন করে আরও কিছু নূতন তথ্য যোগ করলেন। তারপরে আর একজন। আমরা যখন সেই তথ্য নিয়ে আলোচনা করি, তখন সে বিষয়ে যে বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ অবদান দিয়েছেন, তাদের নামই আমরা বিশেষভাবে গ্রহণ করি।

গ্যালিলিওর পূর্বে কোপরনিকস্ কিছু বিশেষ আবিষ্কার করেছিলেন। তারপরে নিউটন এলেন, তারপর কিছু সময় গেল এমনি। তার পরে এলেন আইনষ্টাইন্। তিনি সেই তথ্যের

পরে নূতন তথ্য আবিষ্কার করলেন। তার পর একজন, তার পর একজন— এই রকম হয়ে এ পর্য্যন্ত এসেছে।

পারমার্থিক রাজ্যেও এই সূত্র অনুসারে কাজ হয়।

যারা এই সামান্য কথা বুঝতে পারে না, তারা কেবল স্থূল আকারটাকেই বিচার করতে বসে। প্রকৃত পারমার্থিক সত্য কি তা তারা অনুভব করতে পারে না। তারা ভাবে, শারীরিক অনুবর্ত্তনটাই গুরুপরম্পরা। কিন্তু যাদের পারমার্থিক চক্ষু খুলে গিয়েছে, তারা বলে, "না প্রথম আচার্য্যের কাছে যা দেখা গিয়েছিল, তা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তিতে নাই। কিন্তু চতুর্থ আচার্য্যের বেলায় তা দেখছি।"

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর অবদান অন্য যে কোনও আচার্য্যের অবদানের চেয়ে কম নয়। তিনি হয় ত' অন্য ধারার অর্থাৎ মাধ্বসম্প্রদায়ের ব্যক্তি। কিন্তু বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে তিনি গৌড়ীয় গুরুবর্গের মনোভীষ্টই সার্থক করেছেন। তাই তাঁর অবদানকে আমাদের গুরুবর্গ আত্মসাৎ করে নিয়েছেন।

শাস্ত্রগুরু, শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, নামগুরু— এ সকলকে নিয়েই আমাদের পরম্পরা সাব্যস্ত হয়েছে। তার দ্বারা শুদ্ধভক্তিধারা অক্ষুন্ন রয়েছে। যেখানেই আমরা অনুরূপ শিক্ষা পাই, তাকেই আমরা সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছি।

আমরা শ্রীরামানুজাচার্য্যকে অর্থাৎ শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণকে স্বীকার করেছি, কিন্তু সহজিয়া সম্প্রদায়কে গ্রহণ করি নাই। আমরা সহজিয়া সম্প্রদায়কে কেন স্বীকার করি না, তার কারণ হল তারা কেবল বাহ্য অনুকরণপ্রিয়। মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মকে যারা বিকৃত করেছে, খণ্ডিত করেছে তারা বাহিরে শ্রীমন্ মহাপ্রভু, রূপ-সনাতন প্রভৃতিকে স্বীকার করলেও তারা বিচারভ্রষ্ট।

অপরপক্ষে শ্রীরামানুজাচার্য্য ও মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম্মের মৌলিক সিদ্ধান্তকে পুষ্ট করেছেন, শ্রীনিম্বার্ক বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যবর্গও অনেক কিছু করেছেন।

একটা প্রবাদ আছে "কোনটা বেশী দরকার— নাক না নিশ্বাস।" যারা বুদ্ধিমান্ তারা বলবেন নিশ্বাসটাই বেশী দরকার। নাকটা কেটে যেতে পারে, কিন্তু যদি নিশ্বাস চলে, তবে সবই ঠিক থাকে।

তাই আমরা স্থূল দেহধারীগণের পরম্পরার, পরিবর্ত্তে তাত্ত্বিক চৈতন্য পরম্পরাই অনুসরণ করি।

একজন প্রকৃত সাধুর শিষ্য সাধু নাও হতে পারে; তা ত' সচরাচর আমরা দেখি। কৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, —

স কালেনেহ মহতা
যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।

সেই যোগ কালের প্রভাবে কলুষিত হয়ে গেল। সত্যের পথ, পরমার্থের পথ আশ্রয় করেও অনেককে বিচ্যুত হতে দেখা যায়। তাই দৈহিক উত্তরাধিকার গুরুপরম্পরার মানদণ্ড নয়। পরমার্থ ধারার অনুসন্ধানই মুখ্য।

এই বিশুদ্ধ ভক্তিপ্রবাহ আমরা যেখানে পাব, তাকে স্বীকার করে নেব। তা রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক যে সম্প্রদায়ই হোক। কিন্তু নিজের সম্প্রদায়ও যদি হয়, তাতে বিশুদ্ধ ভক্তিপ্রবাহ না থাকলে, তাকে আমরা স্বীকার করি না।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ত' মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সংস্পর্শে এলেন, তখন তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবত ও শ্রীজীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভের টীকাও লিখেছিলেন। তাঁর অবদান অমূল্য। সেই রকম আমার নিজের আত্মীয় স্বজনগণ যদি আমার গুরুকে স্বীকার না করে বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে স্বীকার না করে, তবে তাদেরও বাদ দিতে হবে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ আমাদের এই প্রকার গুরু পরম্পরাই শিক্ষা দিয়েছেন। ভগবৎপ্রেমভক্তির ধারা যেখানেই প্রবাহিত দেখব, সেখানেই আমরা নতমস্তকে তাকে গ্রহণ করব। এপথ যতই আঁকাবাঁকা হোক না কেন, তাই আমাদের গুরুপরম্পরা। আমরা 'সার' গ্রহণ করব, 'আকার' নয়।

সত্যের বক্রপথ

আমরা সত্যের অনুসন্ধানের জন্য সব ছেড়েছি। তাই যেখানেই সত্যের সন্ধান পাব, সেখানেই মাথা নত করব। যদি কোন মহাজন বলেন যে এইটিই সত্যের পথ, তবে তা গ্রহণ করবার জন্য আমরা প্রস্তুত। আমরা কেবল স্থূলদৃষ্টি নিয়ে কোন পথকে আঁকড়ে ধরে থাকব না। আমরা যে পথ দিয়ে চলেছি তাতে যদি সত্যের পথ রুদ্ধ দেখি তবে অন্য যে কোন পথে তা প্রবাহিত দেখি, সে পথ যতই বাঁকা হোক না কেন, তাই আমাদের অনুসরণ করতে হবে।

আমরা কেবল ক, খ, গ এর ধরাবাঁধা পথের পথিক নই। এদিক ওদিক, যে দিকেই পারমার্থিক সত্তা পাই, সেই দিকেই চলব। আমাদের প্রেমের ইষ্টদেবকে যে পথেই পাই, সে পথই আমাদের অনুসরণীয়। কোন গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের বাঁধা বিধি-নিষেধের দাস নই।

কৃষ্ণ বলেন, "সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"।

যে দিকেই কৃষ্ণের মাধুর্য্য সৌরভের আঘ্রাণ পাই, আমরা সেই দিকেই ছুটে চলব। সে পথ যতই দুঃখকষ্টের, বক্রবন্ধুর উঠানামা হোক না কেন। আমরা ত' কৃষ্ণকে চ্যালেঞ্জ করে বলব না, কেন তিনি এদিক থেকে ওদিক হবেন। তিনি স্বেচ্ছাবিহারী, আমরা তাঁকেই চাই, তিনিই ত' আমাদের জীবনবন্ধু, জীবনের জীবন! তিনি আমাকে দৌড় করিয়ে যদি সুখী হন তবে তাই আমার কাম্য।

যে অন্ধ, তার কথা ভিন্ন। কিন্তু যার চোখ আছে, যে ঠিক দেখতে পায়, সে যেদিক থেকে অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তির সাহায্য পাবে, সেই দিকেই ছুটবে। যে নৌকা স্রোতের টানে ভেসে চলেছে, যে যে দিক্ থেকেই রক্ষা পাওয়ার সহায় পাবে, তাকেই আশ্রয় করবে।

আমরা যদি শিবের উপাসক হই, আর যদি বৈকুণ্ঠ বিহারী নারায়ণের বৈশিষ্ঠ্য উপলব্ধি করি তবে কি পূর্বের শিবপূজায় বাঁধা থাকব? আবার যদি তদুপরি গোলোক বিহারী কৃষ্ণের রসগত বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্যপ্রতি আকৃষ্ট হই, তবে কি কেবল নারায়ণ পূজায় বাঁধা থেকে যাবো? তারপর আমরা গীতার কৃষ্ণের চেয়ে ভাগবতের কৃষ্ণের অধিক রস মাধুর্য্য পাই তবে কি কেবল গীতার কৃষ্ণেই রয়ে যাব? কৃষ্ণ যদি তাঁর উত্তরোত্তর রস মাধুর্য্যের স্বাদ চাখিয়ে উন্নততর রসে নিয়ে যান তবে কি আমরা তাঁর পেছনে না ছুটে পূর্বের স্তরেই থেকে যাব?

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বৃহদ্ভাগবতামৃতে গোপালমন্ত্র উপাসক গোপকুমারের আখ্যান দেওয়া আছে এবং তাতে গোপকুমার কিভাবে একটি স্টেজ্ ছেড়ে আর এক স্টেজ্ বা ক্রমোন্নত স্তরে চলেছেন, তা দেখান হয়েছে। তাতে ভক্তির ক্রম-সোপান — প্রথমে কর্ম-কাণ্ডী ব্রাহ্মণ থেকে ধার্মিক রাজা তারপর ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব, প্রহ্লাদ, হনুমান, পাণ্ডব, যাদব, উদ্ধব, শেষ স্তর ব্রজগোপী। এই প্রকার ভক্তি ও ভক্তের শ্রেষ্ঠত্বের তারতম্য প্রদর্শিত হয়েছে।

এই প্রকার আঁকা-বাঁকা পথে সোপানের পর সোপান, এগিয়ে চলেছে গোপকুমার, তার তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়েছে ব্রহ্মগোপী দেহ প্রাপ্তিতে।

এই সব স্তর বা সোপানের গুরুপরম্পরা রয়েছে। প্রহ্লাদ, হনুমান, পাণ্ডব, শিব - সকলেরই গুরুপরম্পরা রয়েছে। ব্রহ্মা, শিব— এরা নিজেরাই গুরু এবং গুরুপরম্পরার স্রষ্টা। কিন্তু গোপকুমার তাঁদের ছাড়িয়ে গিয়েছেন। কারণ তাঁর ভক্তিতৃষ্ণা তাঁদের দ্বারাও শান্ত হয় নাই, শেষে বৃন্দাবনে না পৌঁছান পর্য্যন্ত।

আমাদের গুরুপরম্পরা অনুসরণ এই বৃন্দাবনধামে পৌঁছান, তার পূর্বে আমাদের

প্রকৃত তৃপ্তি নাই। আমাদের কৃষ্ণচেতনা, কৃষ্ণানুশীলন এই স্তরের, এই জাতীয়। ঐ স্তরীয় কৃষ্ণানুশীলন— বৃন্দাবনধামের কৃষ্ণানুশীলন পথে একস্থানে আমাদের তৃষ্ণা নিবারিত না হলে অন্যত্র অনুসন্ধান করব, যেখানে আমাদের তৃপ্তি আসে, তার উপরে— তার উপরেও যাব। এইভাবে আমাদের গুরুপরম্পরা সব ছাড়িয়ে শেষে ব্রজলীলার কৃষ্ণের চরণে পৌঁছে দেবার পথ— এইটিই কৃষ্ণানুশীলন। শুধু কৃষ্ণচেতনা নয়, চেতনার পর যে অনুশীলন, প্রেমভক্তির রাগানুগা ভক্তির যে অনুশীলন, তাই আমাদের গুরুপরম্পরার অবদান।

আমরা কোন প্রকার জাগতিক পরিচয়ের মধ্যে আবদ্ধ নই।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলেছেন, —

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥

যে ব্যক্তির কৃষ্ণে ভক্তি আছে, সে যে কোন জাতির, যে কোন বর্ণের হোক না কেন, সে-ই গুরু হওয়ার যোগ্য। যদি কৃষ্ণভক্তি না থাকে, তবে নিজের পিতা মাতাও ত্যাজ্য। তাই আমাদের গুরুপরম্পরা হোল শিক্ষাগুরু পরম্পরা।

যারা আমাদের পরমার্থপথে যথার্থ সাহায্য করছে, তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। সংসারের বন্ধন ছাড়িয়ে যারা আমাদের কৃষ্ণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আলোর পথ দেখাচ্ছে, আমাদের অনুভবের তৃষ্ণা দূর করছে, তারা সকলেই গুরু। এই বিচারে সকলেই শিক্ষাগুরু। সব বৈষ্ণবই আমাদিগকে পরমার্থ পথে যেতে প্রেরণা দিচ্ছে, উৎসাহ দিচ্ছে, কাজেই সকলেই শিক্ষাগুরু।

যদি মাটির ঘটিতে গঙ্গাজল থাকে আর সোনার ঘটিতে অন্যজল থাকে, আমরা কোনটিকে চাইব? যারা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ শুদ্ধবুদ্ধি সম্পন্ন, তারা গঙ্গাজল ভর্ত্তি মাটির ঘটিকেই নেবে। তাই ভেতরে যা আছে, তারই মূল্য, পাত্রটার নয়। আমরা ভিতরের বস্তু চাই, আকার নয়।

দেহটাই কি আমি?

'আমি' এই দেহটাই নই। দৈহিক গুরুপরম্পরাকে আঁকড়ে ধরলে আমার আত্মস্বরূপ ভুলে দেহটাকেই আমি বলে স্বীকার করতে হয়; কিন্তু তা ত' বাস্তব নয়। আমি যদি দেহ না হয়ে আত্মা হই, তবে আমাকে আত্মদর্শনের পথ বেছে নিতে হবে এবং তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথ।

পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণের সময় যুধিষ্ঠির আগে আগে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় পড়ে যাবেন, এ ধারণা কারোরই ছিলনা। অর্জুনও জানতেন না যে তাঁর ভ্রাতাগণ পড়ে যাবেন। কিন্তু অর্জুন পড়ে যাওয়ার পর একটি কুকুর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পেছনে যাচ্ছিল। আমাদের যাত্রাপথেও দেখতে পাই অনেকে পড়ে গেলেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাব, তাতে যখন যা সাহায্য পাই তাই নিয়ে চলব।

কারো কারো পতন হতে পারে। এমন কি কোন মধ্যম অধিকারী গুরুর পতন হয়ে বাদ পড়ে যেতে পারে। এমনও হতে পারে, আমার গুরু যিনি আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন, তিনিও ভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারেন, যদিও তা আমার একপ্রকার দুর্ভাগ্য। তথাপি আমি হতাশ না হয়ে নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্যম নিয়ে আমার প্রভুর কৃপার জন্য আর্জি জানিয়ে এগোব।

প্রথমে চাই পূর্ব থেকে সঞ্চিত সুকৃতি। তার পরে শ্রদ্ধাই আমাকে পথ দেখাবে।

এই শ্রদ্ধা একটা কেবল সাধারণ বিশ্বাস মাত্র নয়। শ্রদ্ধারও শ্রেণীবিভাগ ও তারতম্য আছে। কৃষ্ণধামে ফিরে যাওয়ার যে শ্রদ্ধা, তা এক বিশেষ ধরণের। ঐ বিশেষ শ্রদ্ধা যদি কারো থাকে, তবে ঐ দুর্ভাগ্যজনক অবস্থাতেও সাধক নিশ্চয়ই উন্নত স্তরে যাওয়ার প্রেরণা লাভ করবে।

অদৃশ্য গুরু

এ অবস্থায় অদৃশ্য গুরুগণ সৎসাধককে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। তাঁদের হয়ত' আমি স্থূল চোখে দেখতে পাইনা। তাঁরাই আমার অন্তরে প্রেরণা দেবেন। তাঁদের দেওয়া আন্তর প্রেরণা দ্বারা আমি লক্ষ্যপথে এগোব। এই একপ্রকার গুরুপরম্পরা।

গুরু কে? গুরু কি একটা দেহমাত্র? গুরু কি একজন বৈরাগী বা সন্ন্যাসী? কপট সাধুবেশধারী মাত্র কি গুরু? যে ব্যক্তি আমাকে কৃষ্ণের দিকে মহাপ্রভুর দিকে এগিয়ে যেতে প্রেরণা দেন, তিনি যে কোন ব্যক্তি হন না কেন তিনিই গুরু।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে বললেন, "রামানন্দ, তুমি কেন সংকোচ করছ? তুমি কি মনে ভেবেছ, আমি একজন সন্নাসী আর তুমি গৃহস্থ? তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে এত দ্বিধাবোধ করছ কেন? তুমি কি মনে করছ যে, আমার মত একজন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীকে তোমার পক্ষে উপদেশ দেওয়া ভাল দেখায় না? কোন সংকোচ কর না। কৃষ্ণকে তুমিই বেশী জান। সাহস্ ধর, আমাকে কৃষ্ণ দাও।"

এই প্রকার কথা বলে মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে উৎসাহিত করেছিলেন। মহাপ্রভু

আবার বললেন, "কৃষ্ণের কৃপায় তোমার কাছে ঐ পুঁজি আছে, তা আমাকে দানকর। তুমিই প্রকৃত ক্যাপিটালিষ্ট— পুঁজিপতি। আমি এই জগৎকে জানিয়ে দিতে এসেছি যে, তুমিই কৃষ্ণধনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী পুঁজিপতি, আর তা জগতের উপকারের জন্য বিনিয়োগ করতে হবে। সংকোচ কর না, কুণ্ঠিত হইও না, এগিয়ে এস।"

রামানন্দ বললেন, "নিশ্চয়ই! এত তোমারই মূলধন আমার কাছে জমা রেখেছ আর এখন তা নিতে এসেছ। এত তোমারই ধন। তা আমি বুঝি। আর তা বের করে নেওয়ার জন্য তুমি চাপ দিচ্ছ। বেশ! আমি ত' একটা যন্ত্র মাত্র তোমার হাতে কাজে লাগাবার জন্য। তুমি যা বলাতে চাও, তাই বলব।"

এই ভাবেই উভয়ের আলাপ চলছিল। রামানন্দের নাম ত' আমাদের গুরুপরম্পরায় নাই! আমরা কিন্তু তাঁর কাছে এত ঋণী, তথাপি তাঁর নাম আমাদের গুরুপরম্পরায় স্থান পায় নাই, তিনি কিন্তু আমাদের পরম্পরার অনেক গুরুর চেয়ে অনেক বড়।

শ্রীমতী রাধারাণীর নাম আমাদের গুরুপরম্পরায় নাই। তাই বলে কি তাঁকে বাদ দেবো?

সুতরাং গুরু কে, আগে তা স্থির করা হোক, তার পরেই তার ধারা বের করা যাবে।

প্রথা ভঙ্গকারী আলেকজান্ডার

অনেক সময় আনুষ্ঠানিকতা, অনুষ্টান নিষ্ঠা, বাহ্য আকৃতিকে বাদ দেওয়া দরকার হয়। এক সময় আলেকজান্ডার তার পিতার সহিত একটা গাড়ীতে যাচ্ছিলেন, সেই গাড়ীর দড়িতে একটা গ্রন্থি ছিল, তার উপর লেখা ছিল, যে এই গ্রন্থি খুলতে পারবে, সে একজন বিজয়ী সম্রাট হবে।

আলেকজান্ডার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন,— "বাবা! এটা কি?"

বাবা উত্তর দিলেন, এই গ্রন্থি খুব জোরে বাঁধা আছে। তাতে লেখা আছে, যে সেটা খুলতে পারবে, সে ভবিষ্যতে রাজা হবে।

আলেকজান্ডার বললেন,— "আমি খুলে দেব।"

তিনি খড়্গ বার করে ঐ গ্রন্থিটা কেটে দিলেন। এখন বোঝা গেল, অনুষ্ঠানটাই বড় ফল নয়। সেই সময় আর একজন সেখানে ছিলেন, তিনি বলে উঠলেন,— হাঁ! ইনি নিশ্চই রাজা হবেন, এর অন্যথা হতে পারে না।

এটি একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। যদি আনুষ্ঠানিক বিধি পালন করতে হত, তা হলে তিনি রাজা হতে পারতেন না। কলম্বাসের জীবনেও এই রকম ঘটেছিল।

একজন তাঁকে বললেন,— "তুমি কি একটা ডিমকে একটা সুঁচের ডগায় রাখতে পার?

কলম্বাস ডিমটাকে ফুঁটিয়ে তাকে সেই সূঁচের ডগায় রেখে দিলেন আর বললেন, এই ত' আমি রেখে দিলাম। এইটাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

তাই প্রকৃত বাস্তব গুরুপরম্পরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই পাওয়া যায়। আমাদের সাধন রাজ্যে যেখান থেকে অনুকূল সহায়তা পাব, সেখানেই নতমস্তকে তা স্বীকার করে নেব। আমরা আকৃতি নয়, ভেতরের বস্তুকে চাই, অনুকরণ নয় সত্যের অনুসরণ করে সিদ্ধি চাই। এই রকমই আমাদের বিচার ধারা ও মনোবৃত্তি থাকা দরকার।

অধ্যায়-১১

গুরুবর্গের দেশ

শ্রীমদ্‌ভাগবতে বলা হয়েছে, —

> ন হ্যেকস্মাদ্ গুরো জ্ঞানং
> সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্।

ভাঃ ১১।৯।৩১

কেবল একজন গুরুর নিকট কোন সাধক সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারে না। সাধনার সর্বোচ্চ স্তরেও আমরা দেখতে পাই, সেখানে একজন গুরু নাই অনেক গুরু, সর্বত্রই গুরু। কৃষ্ণের ধামে ত' সকলেই গুরু। আমরা ত' সেই ভূমিকার আকাঙ্ক্ষী।

সে ধামে সকল বৈচিত্র্য, সকল পরিবেশটাই গুরুময়। আমরাই সেখানে কেবল দাসানুদাস।

বৈকুন্ঠ বা গোলোকধামে আমরা কেবলই গুরুবর্গের দর্শন পাব এবং তাঁদের পূজা করব। সেখানে গুরুবর্গের শ্রেণীবিভাগ আছে বটে, কিন্তু সকলেই গুরু।

বিভিন্ন শ্রেণীর গুরু আছেন। বৈষ্ণব মাত্রেই গুরু। গুরু যদি শিষ্যকে একখানা পত্রও দেন, তাও অসীম। তার মর্ম জানতে হলে বিভিন্ন উৎস রয়েছে।

সাধনার শেষ পর্য্যায়ে সাধক সিদ্ধির পর সর্বত্রই কৃষ্ণ দর্শন করেন। আমাদের দৃষ্টিকোণ ঠিক থাকলে প্রত্যেক বস্তুই আমার কৃষ্ণস্মৃতির সহায়করূপে দেখা দেবে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বন দেখলেই বৃন্দাবন, পর্বত দেখলেই গোবর্দ্ধন দেখতেন। সিদ্ধিতে যে দিকে তাকাই, সে দিকেই কৃষ্ণের উদ্দীপন। তাঁরা আমাকে শিক্ষা দেন — কৃষ্ণ সেবায় প্রেরণা যোগান। এইটিই ত' গুরুর কাজ। যে বা যা আমাকে কৃষ্ণসেবার সুযোগ দেয়, কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দেয়, সে-ই গুরু। বৈকুন্ঠ ও গোলোকের অনুপরমানুও আমার গুরু। আমরা একটু উন্নতস্তরে পৌঁছালে সর্বত্রই গুরু দেখতে পাব।

গুরু অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন

বদ্ধ অবস্থায় আমরা যা-ই দেখি, সবই আমাদিগকে কেন্দ্র থেকে দূরে টেনে নেয় — বলে, এস ভোগ কর। এইটাই সম্ভোগের আমন্ত্রণের ভূমিকা। অবশ্য ত্যাগেরও কিছু কিছু উপাদান রয়েছে এক নির্দ্দিষ্ট স্তরে। যারা নির্বিশেষবাদী, মুক্তিকামী, তারা বলে, এখানে যা কিছু দেখছি, সবই ক্ষণস্থায়ী। অতএব ত্যাগ কর। কিন্তু ভক্তি হল অন্বয়ের দিক। ভক্তিতে সবই কেন্দ্রের দিকে — কৃষ্ণের দিকে আকর্ষণ করে।

আর যারা তাতে সাহায্য করে, তারাই গুরু। গুরুর অর্থ হল, যিনি ভোগ ও ত্যাগের অন্ধকার দূর করেন।

কৃষ্ণ বলেন, কেবল একটি বিন্দুতে আটকে যেওনা। (আচার্য্য মাং বিজানীয়াৎ)। এতে অনেক শিক্ষাগুরু রয়েছেন আর এত গুরুর সান্নিধ্য পাওয়া ত' আমাদের সৌভাগ্য। ঐ ভূমিকায় অসংখ্য শিক্ষাগুরু সর্বত্রই রয়েছেন। তাঁরা সর্বদাই আমাদের সর্বস্তরে কৃষ্ণদর্শন করার চোখ খুলে দিচ্ছেন। কৃষ্ণ আরও বলেন, —

"যো মাং পশ্যতি সর্বত্র
সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।"

যাবতীয় বস্তুর মধ্যে আমরা কৃষ্ণকেই দর্শন করব। তা হলেই আমাদের স্থিতি নিরাপদ। গুরুদর্শন না করাই বিপদ্। যদি সর্বত্র গুরু দর্শন করি, তবে তাঁরা আমাদের সমগ্র সত্তা দিয়েই কৃষ্ণসেবা করার শক্তি সঞ্চার করবেন। তখন আমাদের আর কোন চিন্তার কারণ নাই। এক বিশেষ গুরুদর্শন আছে। তা এই — কৃষ্ণ বলেন, "আমিই আচার্য্য! তাঁর মধ্যে আমাকেই দর্শন কর।"

রত্ন হাতের মুঠোর মধ্যেই

আচার্য্য কে? যিনি নিজের আচার্য্যকে যথার্থ মর্য্যাদা দিতে জানেন, তিনিই। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ তা একটা টীকায় লিখেছেন,— রূপ ও সনাতন গোস্বামী গোবিন্দকে কিভাবে জগতে বিতরণ করেছেন। যদি কারো হাতে একটা মুক্তা থাকে, সে তাকে নানা রকম ভাবে দেখাতে পারে। রূপ ও সনাতন নানা প্রকারে গোবিন্দকে দর্শন করিয়েছেন। হাতের মুঠোর মধ্যে থাকা রত্নের মত তাঁরা গোবিন্দ নামক-রত্নকে জগতে বিলিয়ে দিয়েছেন।

আমরা এক স্থান থেকে যা জ্ঞান লাভ করি, তাকে অনেক দিক্ দিয়ে সমর্থন করিয়ে

নেওয়া দরকার। তা হলেই সেজ্ঞান পরিপক্ক হয়। ন্যায়শাস্ত্রে বা তর্কশাস্ত্রে বস্তুজ্ঞান্ লাভের ছয়টি উপায়ের উল্লেখ আছে,— বিষয়— (থিসিস্), সংশয়— বিরোধ (এ্যন্টিথিসিস্) পূর্ব্বপক্ষ— প্রশ্ন; মীমাংসা— সমাধান (সিন্থিসিস্) সিদ্ধান্ত— উপসংহার (কন্‌ক্লুজন্); সঙ্গতি— প্রমাণ (ভেরিফিকেসন্)।

এজগতে এই ছয়টি বিচারের পরেই কিছু সত্য নিরূপিত হয়। প্রত্যেক জ্ঞান একটি সূত্র থেকে লাভ করা গেলেও অনেক সূত্রসহ তার বিচার করা গেলে, তার পর জ্ঞান প্রমাণসিদ্ধ বলে গণ্য হয়।

আমাদের প্রাথমিক ভগবৎ সম্বন্ধ সাধারণভাবে এথা-ওথা, যেখান-সেখান থেকে সামান্য পরিমাণে আরম্ভ হয়। প্রথম অবস্থায় একে বলে 'অজ্ঞাত সুকৃতি'। অজানা পবিত্র ক্রিয়া, তার পর জ্ঞাত-সুকৃতি। জেনে বুঝে পবিত্র কর্ম। এর ফলে হয় শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা, তার পরে সাধুসঙ্গ। অর্থাৎ এইভাবে বিভিন্ন সূত্র থেকে কিছু কিছু সুকৃতি সঞ্চয় করে শেষে কোন মহান্ত সাধুর সঙ্গলাভ হয়; যাঁর কাছ থেকে আমরা পরমার্থ লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য লাভ করি এবং তাঁর কৃপায় তাঁর চরণাশ্রয় করি।

তারপর দেখি, অনেকেই তাঁর চরণাশ্রয় করে রয়েছে। তাঁদের কাছেও পারমার্থিক সহায়তা লাভের সুযোগ হয়। তখন শ্রীগুরুদেবও কিছু সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করার নির্দ্দেশ দেন। তিনি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করতে উপদেশ দিয়ে বলেন, "এই গ্রন্থপাঠে তুমি বহু প্রকারের গুরুদেবের বাণী শ্রবণ করবে।"

সকলেই গুরু

সকলেই কিছু কিছু সাহায্য করেন। তার ফলে আমরা দেখি যে, আমরা বহু গুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করেছি। সকলেই গুরু, সকলেই কৃষ্ণানুসন্ধান করার উপায় বলেন, কৃষ্ণসেবার সুযোগ দেন। এইটি কম সৌভাগ্যের কথা নয়। সকলকেই গুরুর সম্মান দেওয়া, কেউই আমার সেবক নয়, সকলেই সেব্য, পূজ্য।

আমরা জগতে প্রত্যেকের কাছ থেকে কিছু না কিছু গ্রহণ করি। তারপর ত্যাগ করতে শিক্ষা করি, তবে এ দুইটিই শূন্য অবস্থা। কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে আমরা সকলকেই সেব্যজ্ঞানে, নিজেকে সেবকজ্ঞানে সেবা করব, তখনই আমরা সেবার রাজ্যে, সমর্পণের রাজ্যে প্রবেশ করি। এই তিনটি স্থিতিকে আমি তিনটি নাম দিয়েছি— ল্যাণ্ড অফ্ এক্সপ্লয়েটেসন্, ল্যাণ্ড অফ্ রিনান্সিয়েসন্ এবং ল্যাণ্ড অফ্ ডেডিকেশন্ অর্থাৎ ভোগের রাজ্য, ত্যাগের রাজ্য ও সেবার রাজ্য — ভোগের অবস্থা, ত্যাগের অবস্থা ও সেবার অবস্থা।

সকলেই আমার গুরু, এর অর্থ সকলেই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, সকলেই আমাকে শুভাশীষ দিয়ে, সৎপথ দেখিয়ে জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে আমাকে নিয়ে পৌঁছাবার জন্য আগ্রহী। এতে আমার দিক থেকে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ভগবানেরও স্তরভেদে প্রকাশ ভেদ বা তারতম্য রয়েছে যেমন— বাসুদেব, বিষ্ণু, নারায়ণ, দ্বারকেশ, মথুরেশ, ব্রজেশ স্বয়ং ভগবান্ পূর্ণতম কৃষ্ণস্বরূপ ইত্যাদি। সেইরূপ সাধুরও স্তরভেদ রয়েছে যাদের সঙ্গে আমাদের নিজস্ব আত্মপ্রকাশ ও সাধনভজন রহস্য ধারার কোন সহায়তা পাওয়া যায় না— যেমন, মায়াবাদী, বৌদ্ধ, অদ্বৈতবাদী নাগা-সম্প্রদায় ইত্যাদি। এদের মধ্যে গিয়ে তাঁদের উপদেশ নেওয়া আমাদের বিচার ও সাধনধারার পরিপন্থী। তাই আবার বলা যাচ্ছে, যেখানে সেখানে গিয়ে গুরু অনুসন্ধান কোরনা। তাতে অসুবিধা রয়েছে। আমরা যে পথ নিয়েছি, সেই পথে সকলেই গুরু, তাঁরাই আমাকে অভীষ্ট পথে— অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাবে।

প্রাথমিক স্তরে এই সাবধানবাণী খুবই দরকার। কারণ অনেক প্রতারক আছেন, সাধুবেশধরী। তাদের কবল থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে।

সাধু সঙ্গ নির্ণয়

সাধনার একটা নির্দ্দিষ্ট স্তরে আমাদের তাই বিজাতীয় সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে হবে। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।২।৯১) বলেছেন,—

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে"

আমরা কি প্রকার সাধুর সঙ্গে নিত্য কালের জন্য সঙ্গ করব?

যারা আমার নিজের ধারার সাধু, যারা এই ধারায় আমার চেয়ে উন্নত স্তরে পৌঁছেছেন এবং যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতি স্নেহ-কৃপাযুক্ত, কেবলমাত্র ঐ প্রকার সাধুর সঙ্গেই আমরা আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব।

পথে নানা বাধা আসতে পারে, কিন্তু আমরা যদি অকপট, আন্তরিক একনিষ্ঠ হই, তবে কোন ব্যক্তিই আমাদের প্রতারিত করতে পারবে না। কারণ কৃষ্ণত' আমাদের হৃদয়ে রয়েছেন, তিনি আমার অন্তরের সর্ব্বস্য আপন করে নিয়েছেন, আমাদের নৈরাশ্য বা বিফলতা আসতেই পারে না।

"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

কৃষ্ণ সবই জানেন, তিনি আমায় দেখছেন। যত বাধাই আসুক, সবই দূর হয়ে যাবে তাঁর করুণা-কটাক্ষের দ্বারা, আমরা সিদ্ধিলাভ করবই।

অধ্যায়-১২

দাসানুদাস

যেদিন আমরা গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করি, কৃষ্ণে আত্মনিবেদন করি, সেই দিনটিই আমাদের সব চেয়ে শুভদিন। আমার অনেক জন্মদিনই গিয়েছে, কিন্তু এই দেহের জন্মদিনেই যদি আমার গুরুকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ হয়, তবে এইটিই আমার পক্ষে শুভদিন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সময় সম্পর্কে রায় রামানন্দের কথায় উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীমতী রাধারাণী বলেন,—

"যে কালে বা স্বপনে
দেখিনু বংশীবদনে"

যখন স্বপ্নে কখনও শ্রীকৃষ্ণকে দেখি, তখন দুটি শত্রু এসে দর্শনে বাধা দেয় — তার একটি হল আনন্দ অপরটি হল মদন। উৎকণ্ঠায় আনন্দে চোখে অশ্রু ভরে যায়, তাই কৃষ্ণদর্শনে বাধা হয়। উৎকণ্ঠায় কম্প আসে, অস্থির করে তোলে, তাই কৃষ্ণকে দেখবার তৃষ্ণা আমার মেটে না। আবার যদি কৃষ্ণের দর্শন পাই, তবে সেই মুহূর্ত্তটাকে পূজা করব — চন্দন, ফুল, মালা আর রত্ন দিয়ে সেই 'ক্ষণ' কে ধরে রাখব, সেই সময়টি যাতে আরও বড় হয়ে যায়, যাতে বেশী সময় আমি কৃষ্ণকে দেখতে পাই। সময় যদি আমার পূজা-প্রার্থনা শুনে থেমে যায় তবে তাই করব, কৃষ্ণকে বহু সময় ধরে দেখতে থাকব। সময়! তুমি স্থির হয়ে যাও, চিরস্থায়ী হয়ে যাও, তা না হলে ত' কৃষ্ণ বিদ্যুতের মত দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আমরা সময়, ধাম, পরিকর পরিবেশ যা কিছু কৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত, তাঁকেই আরাধনা করি। কৃষ্ণসম্বন্ধে সবই চিন্ময়, অপ্রাকৃত। কৃষ্ণের পরিকরকে কৃষ্ণের চেয়ে আমরা বেশী চাই। কারণ তাইত' আসল চাবিকাঠি। কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধিত যা কিছু, তাঁর সেবা করলে, তাঁরা আমাদিগকে কৃষ্ণধামেই নিয়ে যাবে। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে—

আরাধনানাং সর্বেষাং
বিষ্ণোরারাধনং পরম্।

তস্মাৎ পরতরং দেবি
তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্

একদা পার্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন, কার আরাধনা সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ? শিব বললেন, — "বিষ্ণু বা নারায়ণের আরাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ।"

একথা শুনে পার্বতী মনে মনে একটু দুঃখিতা হলেন এই চিন্তা করে যে, তিনি যখন শিবকেই পূজা করেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই ছোট। তারপরেই মহাদেবের বাক্য —

তস্মাৎ পরতরং দেবি
তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।

অর্থাৎ নারায়ণের আরাধনা অপেক্ষা নারায়ণ ভক্তের আরাধনা শ্রেষ্ঠ।

তাই শুনে পার্বতীর মন ভাল হয়ে গেল। তিনি হাসলেন, কারণ তিনি ভেবে নিলেন, আমি যখন ভগবানের পরমভক্ত শিবের আরাধনা করছি 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ', তাই আমি তা হলে সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনাই করছি।

এই কথার সমর্থন আদিপুরাণে কৃষ্ণের মুখে বলা হয়েছে,—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ
ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্‌ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাঃ
মম ভক্তাস্তু তে নরা ॥

যারা আমাকে সোজাসুজি ডাইরেক্টলি আরাধনা করে, তারা আমার প্রকৃত ভক্ত নয়। যারা আমার ভক্তের ভক্ত, তারাই আমার প্রকৃত ভক্ত।

এই সত্য ত' আমরা নিজের জীবনেই দেখতে পাই। লোকে বলে তুমি যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার কুকুরকেও ভালবাসবে।

প্রভুর কুকুরকে ভাল বাসলে প্রভুর প্রতি ভালবাসা কত গভীর তা বোঝা যায়। কুকুরকে ভালবাসে এইজন্যই, সে যে তার প্রভুর কুকুর। কুকুরকে সে নিজে নিয়ে যাবে, তা নয়। কুকুরের প্রতি পৃথক ভালবাসা নয়, ভালবাসা এইজন্য— সে প্রভুর কুকুর।

সাধারণ ভালবাসার চেয়ে এই প্রকার ভালবাসাই যে শ্রেষ্ঠ, তার এই পরীক্ষা। ভক্তের প্রতি ভালবাসাই কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসার প্রকৃষ্ট পরিচয়। কৃষ্ণ যখন দেখেন কেউ তাঁর ভক্তকে ভালবেসে সেবা করে, তখন তিনি খুবই প্রীত হন। ভক্ত ত' কৃষ্ণকে ভালবেসে

সব সময় তাঁর সেবা করে। কিন্তু ভক্ত ত' কৃষ্ণের কাছ থেকে কিছুই চায়না।

কোন পারিশ্রমিক বা অন্য কিছু কামনাও ভক্ত করে না। কৃষ্ণ সব সময় তাঁর ভক্তকে দিতে চান, কিন্তু কোন ফাঁকই তিনি পান না।

কৃষ্ণ দিতে চাইলেও দিতে পারেন না, পরাজিত হন। তাই যখন তিনি দেখেন, তাঁর ভক্তকে কেউ সেবা করছে, তাতে তিনি ঐ ভক্তসেবকের প্রতি যৎপরোনাস্তি প্রীত হন। ভক্তের ভক্ত এই কারণেই কৃষ্ণের খুব প্রিয়। তিনি তার ভক্তের কিছুই করতে পারছেন না, যত চেষ্টা করেন, পরাস্ত হন। ব্যস্ত হওয়ারই কথা! তাই যখন কোন ব্যক্তি তাঁর ভক্তকে সেবা করছে, যা দিচ্ছে, তা ভক্ত ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করছে, তখন তিনি ঐ ভক্তের ভক্ত যে, তার সেবা করেন। কৃষ্ণ এতই ভক্তজনপ্রিয়।

তাই ভক্তপূজাই ভক্তিসাধকের সব চেয়ে বড় সাধনা। এই কথাই শ্রীমদ্‌ভাগবত, বেদ-পুরাণের।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখেছেন, "আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।" ভক্তপূজা সর্বশাস্ত্রের সার কথা।

এখন প্রকৃত ভক্ত কে, তা স্থির হওয়া দরকার। ভক্তের লক্ষণ কি?

কৃষ্ণ বলেন, "যারা বলে আমার সাক্ষাৎ ভক্ত, তারা আমার প্রকৃত ভক্ত নয়; আমার ভক্তের ভক্তই আমার প্রকৃত ভক্ত।

এই কথার মর্ম আমাদের বোঝা দরকার। এটা ত' কোন বাজে কথা নয়, হালকা কথা নয়। এর মধ্যে গভীর রহস্য আছে। এর অন্তর্নিহিত অর্থ চিন্তা করলে আমাদের গুরু মহারাজের কথা মনে আসে। তিনি বলেছেন, "আমরাই শুদ্ধ শাক্ত"— প্রকৃত শক্তির উপাসক। আমরা সেই শক্তির উপাসক, যে শক্তি সম্পূর্ণরূপ কৃষ্ণের সুখের জন্য সমর্পিত, যে শক্তি নিজের কোনও পৃথক সত্তা না রেখে শক্তিমান্ কৃষ্ণের ষোল আনা নিজের। এই শক্তি ব্যতীত আর কোনও শক্তি সেই পর্য্যায়ে যেতে পারে না।

ভক্তের মাধ্যম বাদ দিয়ে কৃষ্ণের স্বতন্ত্র সেবা আমাদের কাম্য নয়। এই কারণে আমরা মীরাবাঈ প্রভৃতি অনেক ভক্তকে আমাদের পরম্পরার মধ্যে গণ্য করিনা। তাঁরা কৃষ্ণের প্রেমে পাগল, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সেবায় উদাসীন।

পারমার্থিক ব্যুরোক্রাসী

কৃষ্ণ একা নন। রাজা একা হয় না। তাঁর পরিকর-পরিজন ইত্যাদি সমস্তকে নিয়েই

রাজা। রাজার কাছে যেতে হলে যথার্থ মাধ্যম অর্থাৎ অনুগত সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই যেতে হয়। এত বিরাট্ সেবক সম্প্রদায়কে ডিঙ্গিয়ে সোজা রাজার কাছে কেউ যেতেই পারে না। সেই রকম কৃষ্ণের এতবড় বিশাল সাম্রাজ্য, সে ত' রাজাধিরাজ, কত কোটি কোটি ভক্ত তা আবার বিভিন্ন রসের ভক্তশ্রেষ্ঠগণের আমলাতান্ত্রিক (ব্যুরোক্রাটিক) বিধি-ব্যবস্থা সবগুলোকে ডিঙ্গিয়ে কৃষ্ণের কাছে কেউ সোজা চলে যেতে পারেনা। কৃষ্ণ ছাড়া আর সবই সেই শক্তির কায়ব্যূহ বিস্তার।

সেই শক্তি বা তাঁর কায়ব্যূহ গণের কৃপাতেই আমরা কৃষ্ণের ধামে, তাঁর দরবারে প্রবেশাধিকার পাব। এই ভাবে আমরা যথার্থ শাক্ত — শক্তি-উপাসক।

ভক্তগণের দয়া ও সাহায্যেই আমরা কৃষ্ণের কাছে যেতে পারি।

অনেক সময় দেখা যায়, কেউ একজন কৃষ্ণের বড় ভক্ত। কিন্তু তিনি যদি কৃষ্ণের ভক্তগণকে অস্বীকার করেন, তবে সে প্রকার ভক্তি পরিপুষ্ট বা পূর্ণাঙ্গ তা বলা যায়না। ভক্তির সুপুষ্ট আকার এখনও তাঁর মধ্যে আসে নাই।

ধরা যাক, আমরা দূর থেকে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর গৌরীশঙ্কর (মাউন্ট এভারেষ্ট) কে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তার কাছে যেতে হলে আমাদের অনেক ছোট ছোট শিখর অতিক্রম করে যেতে হয়, সে গুলির পরিচয়, নাম ইত্যাদি জানতে হয়। গৌরীশঙ্করকে জানা অর্থ সে পর্য্যন্ত পথে যত কিছু রয়েছে, তার পরিচয় ও সংস্পর্শ অতি বাস্তব।

তাই কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ বা যোগ হওয়ার অর্থ হল, তার সমগ্র ভক্ত, সেবক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ। এবং এইটিই যথার্থ কৃষ্ণসম্বন্ধ।

ভক্তির যথার্থ পরীক্ষা

আমরা যখন দাক্ষিণাত্যে প্রচারে ছিলাম, তখন কয়েকজন ভদ্র ব্যক্তিকে জানতাম, তাঁরা প্রায়ই প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুরকে দর্শন করতে আসতেন। আলাপের সময় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁদের যখন জিজ্ঞাসা করতেন, "আপনি কার আনুগত্যে কৃষ্ণভজন করেন। তাঁরা বলতেন, "না-না, আমি কৃষ্ণ বা রামকে সোজাসুজি ভক্তি করি।"

তারা চলে যাওয়ার পর শ্রীল প্রভুপাদকে বল্‌তে শুনেছি "এদের কোন ভক্তিই নাই।"

তারা ভক্তের অনুকরণকারী। তাদের মধ্যে ভক্তির আভাসমাত্র এসেছে। তাদের ভক্তি কোন নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে নাই। কারণ, তারা আশ্রয়বিগ্রহকে স্বীকার করে নাই।

ভক্তগণই আশ্রয়। তাঁদের আনুগত্য ও সহায়তায় কৃষ্ণভজনই প্রকৃত কৃষ্ণভজন।

যারা আশ্রয় আনুগত্য বিনা কৃষ্ণভজন করে, তারা কেবল মুক্তিই চায়। এই প্রকার ভজন সাধারণ স্তরের ভক্তি। তা অপ্রাকৃত ভূমিকার শুদ্ধভক্তি নয়। এ ভক্তি স্থায়ী নয়, সাময়িক। ভক্তিতে মুক্তিকামনা থাকলে তা শুদ্ধভক্তি নয়। সচরাচর এই সাধারণ ভক্তিই দেখা যায়।

গুরু বা আচার্য্যই আশ্রয় বিগ্রহ। একটা বনকে দূর থেকে দেখলে কেবল ঘন সবুজ রংএর একটা দিগন্তব্যাপী আকারই দেখা যায়। কিন্তু তার কাছে গিয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করলে তখন অনেক বৈচিত্র্য চোখে পড়ে।

দূর থেকে কৃষ্ণ আশ্রয় বিগ্রহ বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁর ধামে প্রবেশ করলে আমরা তাঁর সেবক-ভক্ত সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে প্রবেশ করি, তাঁদের মধ্যেই তাঁদের অনুগত একজন হয়ে যাই।

আমরা যারা ভজন করতে এই সংঘে একত্রিত হয়েছি, তাদের সকলের উপর ভরসা করা যায় না। অনেক এসেছে, আবার চলেও গিয়েছে। যারা আছে তারাও নির্ভরযোগ্য নয়, হয়ত অনেকে চলেও যাবে।

তাই আমরা ভগবানের নিত্য ভক্তের মর্য্যাদা দাবী করতে পারি না। আমরা তাঁদের অকপট আনুগত্যে সেবাসুযোগ লাভের অধিকার টুকুই চাই। আমরা ত' নিত্যসেবক নই, নূতনভাবে সংগৃহীত, তাই নিত্যসেবকের আনুগত্যে সেবা করা দরকার। নিজের চেয়ে উন্নত কোন নিত্যসেবকের আদেশ উপদেশ নিয়ে, তাঁর আনুগত্যে কৃষ্ণভজনই প্রাথমিক পর্য্যায়ের নবাগত সেবকগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

সাধুর জীবনচরিত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বরচিত চৈতন্যশিক্ষামৃত গ্রন্থে লিখেছেন যে, প্রেমারুরুক্ষু স্তরের দুই শ্রেণীর ভক্ত আছেন। তাঁরা উভয়েই শুদ্ধপ্রেমভক্তির সাধক। বিবিক্তানন্দী ও গোষ্ঠ্যানন্দী। গোষ্ঠ্যানন্দীর ভক্তগণ সাধারণত প্রচারকার্য্য করে থাকেন। তাঁরা বৈষ্ণবগোষ্ঠীর মধ্যে বাস করেন। কিন্তু বিবিক্তানন্দী ভক্তগণ নির্জনে ভজন করতে ভালবাসেন। তাঁরা একান্ত নির্জন ভজনকুটীরে অবস্থান করে নিরন্তর হরিনাম করেন এবং কৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার মানস-সেবা করেন। এই দুই গোষ্ঠীর ভক্তই অত্যন্ত উচ্চস্তরের ভক্ত, যখন তাঁরা সিদ্ধির শেষ পর্য্যায় উপনীত হন, তখন তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কৃষ্ণ তাঁদের দ্বারা যখন যে সেবা করিয়ে নেন, তা তাঁরা করে থাকেন। তাই যাঁর প্রচার করবার মনোবৃত্তি নাই, তিনি নিম্ন-স্তরের ভক্ত, এ প্রকার ধারণা করা ঠিক নয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মতে তাঁরা উভয়েই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। কেহ বড় বা ছোট নন। উভয়েই কৃষ্ণপ্রেরণায় কাজ করেন।

যাঁরা প্রচার করেন, তাঁরা সাধারণত প্রচার করাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তা যে কৃষ্ণের ইচ্ছা, এটা তারা উপলব্ধি করেন। তাই কৃষ্ণ বলেন,—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"

—আমার প্রেরণাতেই আচার্য্য বদ্ধজীবকে উদ্ধার করেন। কৃষ্ণ যাকে কৃপা করেন তিনিই তাঁকে জানতে পারেন।

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য"

কৃষ্ণ যখন কোন বৈষ্ণবের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করেন এবং তাঁর দ্বারা বদ্ধজীবগণকে উদ্ধার করতে চান, তা তাঁরই কৃপায় কার্যে পরিণত হয়।

স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ ইনারা শিষ্য গ্রহণ করেন নাই বা প্রচার কার্য্য আমাদের

মত করেন নাই বা দ্বারে দ্বারে গিয়ে কৃষ্ণকে বিতরণ করেন নাই। অথচ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং আরও অনেক বৈষ্ণব দ্বারে দ্বারে গিয়ে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেছেন।

কবিরাজ গোস্বামী প্রার্থনা করেছেন,—

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ।"

প্রথমেই তিনি যে সমস্ত গুরুবর্গ বদ্ধজীবগণের উদ্ধার কার্য্য করেছেন, তঁদের বন্দনা করেছেন। তারপর শাস্ত্রগুরুকে প্রণাম করেছেন। শ্রীরূপ-সনাতন প্রচার করেন নাই, কিন্তু শাস্ত্রপ্রণয়ন করে প্রচারকগণকে সাহায্য করেছেন। প্রচারের সহায়ক যাবতীয় বিষয় তাঁরা শাস্ত্রেই সঞ্চয় করে গিয়েছেন।

তাঁরা যদিও সাধারণ জনতার সঙ্গে বিশেষ ভাবে মিশেন নাই; তাঁরা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেরণা ও আদেশে শাস্ত্রপ্রণয়ন করে আমাদের প্রচারের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছেন। তাঁরাই শাস্ত্র-গুরু। যারা শাস্ত্র রচনা করে আমাদের নিত্যকালের জন্য সাধন-ভজন ও প্রচারের প্রেরণা করে চলেছেন, তাঁরাই শাস্ত্রগুরু।

পারমার্থিক স্পর্শমণি

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রথমে আচার্যগুরুবর্গের বন্দনা করেছেন, তার পরে শাস্ত্র-কর্ত্তা গুরুদেব, তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর, যিনি সপার্ষদ অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীতে অভিনব প্রেমভক্তিধারা প্রবাহিত করেছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পাঁচটি পর্যায়ে গুরুবর্গের বন্দনা করেছেন। সর্বশেষ পর্যায়ে তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের এবং তারপরে ললিতা-বিশাখা-প্রমুখ গোপীগণের বন্দনা করেছেন, —

"শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ।"

কৃষ্ণের প্রেরণা লাভকরে শাস্ত্রগুরুবর্গ যা কিছু করেন। তাঁরা বদ্ধজীবের সাক্ষাৎ-সংস্পর্শে আসেন না বলে আমরা তাঁদের স্পর্শমণি বলব না এমন নয়। আমরা প্রচারক আচার্য্যদিগকে কেবল স্পর্শমণি আখ্যা দিলে পক্ষপাত করা হয়।

আচার্য্যগুরুর প্রতি বিশ্বাস থাকা দরকার। তিনি যা করেছেন, তা কৃষ্ণের প্রেরণাতেই করেছেন, এরূপ বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। তাঁদের দিয়ে কৃষ্ণই প্রচার করতে এসেছেন। গুরুর মধ্যে কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। এই বিচারধারা আমাদের সাধন-ভজনে সহায়ক।

তথাপি এই হল আপেক্ষিক বিচার। কিন্তু স্বরূপতঃ প্রচারকারী আচার্য্য-গুরু মধ্যমাধিকারী বা উত্তমাধিকারী। কৃষ্ণের সেবকগণের মধ্যে কিছু শ্রীমতি রাধারাণীর বিশেষ

অনুরক্ত, কিছু চন্দ্রাবলীর, আর কিছু মধ্যস্থ। ভক্তগণের মধ্যেও কিছু ব্রজলীলার প্রতি, কিছু গৌরলীলার প্রতি অনুরক্ত, কিছু মধ্যম। এই প্রকার স্বভাববৈচিত্র্য নিত্যলীলা ও ভৌমলীলাতে দৃষ্ট হওয়া চিরন্তন।

কৃষ্ণলীলার চেয়েও গৌরলীলা অধিক উদার

গোলোকে গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলার সমান প্রাধান্য। কিন্তু আমরা গৌরলীলাকে কৃষ্ণলীলা অপেক্ষা অধিক উদার বলবার সাহস রাখি। গৌরলীলায় গুরুবর্গ নিজেকেই বিলিয়ে দিয়ে থাকেন। কারণ যে বৈষ্ণবগণ নিজের আস্বাদ্য কৃষ্ণপ্রেম জনসাধারণকে বিতরণ করেন, তাঁরা সমগ্র জগতে অশেষ উপকার সাধন করেন। 'লোকহিতায় চ'। প্রচারক আচার্য্যগণ বেশী ভাগ্যবান। কারণ কৃষ্ণ তাদেরদ্বারাই বহু বদ্ধজীবকে মুক্ত করে কৃষ্ণপ্রেম দান করেন।

গৌরলীলা কৃষ্ণলীলার চেয়ে অধিক উদার, তাতে সকলের অধিকার। গৌরলীলা কৃষ্ণলীলার পরিশিষ্ট। কৃষ্ণ নিজ সখাদের সঙ্গে যখন খেলা করেন, তখনকার কৃষ্ণের চেয়ে যখন তিনি কৃপা বিতরণ করেন, সেই কৃষ্ণ অধিক। যারা কৃষ্ণানুশীলনকে জগতে বিতরণ করেছেন, সেই প্রচারক বৈষ্ণবগণকে আমরা অধিক চাই। কৃষ্ণ কয়েকজন ভক্তকে তাঁর কথা প্রচারের জন্য নিজের প্রতিনিধি রূপে প্রেরণ করেছেন, বদ্ধজীব আমাদের পক্ষে তাঁরাই বেশী আবশ্যক।

কৃষ্ণের কতক ভক্তকে বেশী প্রয়োজনীয় বোধ করা যদিও একদেশী বিচার, তথাপি তা করি এজন্য যে, তাঁদের ভিতর দয়া ও সহনীয়তা বেশী, অনেক সময় আমরা যদিও বৈষ্ণবদের তাঁদের কাজ দেখে বিচার করে বসি, তাতে আমরা যে ভুল করিনা, এমন নয়। কৃষ্ণের ইচ্ছায় কোন ভক্ত কোন এক নির্দিষ্ট কাজের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। কৃষ্ণ তাঁর দ্বারা যা করাতে চান তা করিয়েও নিচ্ছেন। কৃষ্ণ বিভিন্ন ভক্তকে দিয়ে বিভিন্ন কাজ করাচ্ছেন। এটা তারই ইচ্ছা। এতে ভক্তগণের কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই।

যখনই আমরা মনে করব যে, কৃষ্ণই আমাকে দিয়ে তাঁর কাজ করিয়ে নিচ্ছেন, তখন সে কাজ নিশ্চই সফল হবে। এই সফলতার জন্য মাধ্যমকে মুখ্য বলে চিন্তা করা ঠিক নয়, হয়ত তাঁর কিছু ভূমিকা আছে। কিন্তু সবের পেছনে কৃষ্ণই রয়েছেন, এটা ভুলে গেলে চলবে না।

সব সময় চিন্তা করা দরকার যে, কৃষ্ণই আমাকে দিয়ে তাঁর কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। তাই ভক্তের কর্ত্তৃত্ব বা আমাদের কর্ত্তৃত্ব দেখার কোন অবসর নাই। কৃষ্ণের ইচ্ছাই

সর্বোপরি। তাই কোন বৈষ্ণব ভক্তের আচার বিচার, প্রচারাদি ব্যাপারে কোন চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় যথেষ্ট বিবেচনা প্রয়োজন।

বাবাজী ও প্রচারক

গৌরকিশোর দাস বাবাজী প্রচার করতেন না। কিন্তু তার শিষ্য আমাদের গুরুদেব প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অতি ব্যাপক আকারে প্রচারকার্য্য চালিয়ে গেলেন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী আদৌ প্রচার করেন নাই। কিন্তু তাঁর একমাত্র শিষ্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বিপুল প্রচার কার্য্য করেছেন। তাই কোন বৈষ্ণবের বাইরের প্রচারাদি দেখেই তাঁর বিচার করতে হবে না। কৃষ্ণই কোন কোন ব্যক্তিকে দিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিয়ে নেন। এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু সারা বঙ্গদেশে প্রচার করলেন। অথচ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত বাইরে কোন প্রচার কার্য্য না করেই শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবের অবতার রূপে পূজিত হলেন। মহাপ্রভুর সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে যে প্রকার ছিল, তা যে সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, একথা সকলেই অনুভব করেন।

তাই বাইরের বিপুল প্রচারাদি মাত্র দেখে বৈষ্ণবের উন্নতস্তর বিচার করা যায় না। তার মূল্য সেবার দিক থেকে যথেষ্ট, এতে সন্দেহ মাত্র নাই— তা যে অভিনন্দনীয় তাও স্বীকার করি, কিন্তু "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য"— সবই কৃষ্ণের দাস, এটি যেন ভুল না হয়।

কৃষ্ণের নৃত্য

কৃষ্ণ কখন কোন ভক্তকে নিয়ে কি নৃত্য করেন, তা দেখতে হবে। সবই তাঁর ইঙ্গিতে চলে। তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে সব।

"যারে যৈছে নাচায়"— এই কথাটি মনে রাখলে "প্রতিষ্ঠাশা" আর স্পর্শ করতে পারে না। নাম, যশ লাভ করার যে তৃষ্ণা, তার লেশ মাত্রও থাকে না যদি কৃষ্ণের কর্তৃত্ব দেখি।

বৈষ্ণবভক্তের বাহ্য আচার দেখে তাঁকে বিচার করা ঠিক নয়, একথা শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীল গদাধর পণ্ডিত ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির লীলা আলোচ্য।

মুকুন্দ দত্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বাল্যবন্ধু। পুণ্ডরীক একবার নবদ্বীপে এসেছিলেন।

মুকুন্দ গদাধর পণ্ডিতকে বললেন, "তুমি একজন বৈষ্ণবের দর্শন করতে যাবে?" গদাধর বৈষ্ণব দর্শনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং মুকুন্দ তাঁকে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বাস ভবনে নিয়ে গেলেন।

গদাধর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে দেখেই নির্বাক। এ কি প্রকার বৈষ্ণব!

সুগন্ধি তৈলাক্ত কুঞ্চিত কেশ, রাজকীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, সোনার জরি দেওয়া হুকার নলমুখে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছেন! সারা ঘর সুগন্ধি আতরের সৌরভ! — এ আবার বৈষ্ণব!

মুকুন্দ গদাধরের মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন, অমনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের নিম্নশ্লোকটি সুললিত স্বরে গান ধরলেন, —

> অহো বকী যং স্তনকালকুটং
> জিঘাংসয়াপায়দপ্যসাধ্বী।
> লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
> কংবা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥

ভাঃ ৩।২।২৩

ওঃ কি আশ্চর্য্য! বকাসুর ভগ্নী পুতনা কৃষ্ণকে মারবার জন্য বিষমিশ্রিত স্তন তাঁর মুখে দিয়েছিল। অথচ কৃষ্ণ তাকে ঐ মাতৃত্বের অভিনয়টুকুর জন্য ধাত্রীর গতি প্রদান করলেন, এমন দয়ালুকে বাদ দিয়ে আর কার আশ্রয় গ্রহণ করব?

এইটি শোনামাত্র পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির ভাবাবেশ হল। প্রেমাশ্রুকম্প স্বেদাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকার তাঁর দেহে প্রকটিত হল। তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। কোথায় রইল তার রাজপুত্রবেশ, সবই ছিঁড়ে ছারখার হয়ে গেল। সোনার হুকো মাটিতে পড়ে গেল। নিজের পূর্বের কুঞ্চিত কেশ টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলেন। কোথায় কৃষ্ণ! কোথায় তাঁকে পাব? এই বলে অশ্রু ঝরাতে ঝরাতে গড়াগড়ি দিতে থাকলেন।

কিছু সময় পরে তাঁর অবস্থা শান্ত হল। গদাধর দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কাকে কি মনে করেছিলাম? এত কৃষ্ণপ্রেম, যাঁর, তাঁকে ভোগ-বিলাসী মনে করে কতই না অপরাধ করেছি! এই ভেবে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন।

তিনি চিন্তা করলেন, "এত বড় ভক্তকে আমি মনে মনে অবজ্ঞা করেছি, মহা অপরাধ করেছি। কি করে এ অপরাধ থেকে মুক্ত হব।" এই অনুতাপে দগ্ধ হয়ে তিনি মুকুন্দকে বললেন, "এই মহাপুরুষের নিকট আমি অপরাধী। শুনেছি বৈষ্ণবের মন্ত্রদীক্ষা নেওয়া

উচিত। আমি এখনও মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করি নাই। আমি যদি উনার চরণাশ্রয় করে উনার কাছ থেকে মন্ত্রগ্রহণ করি, তা হলে তিনি আমার আপরাধ ক্ষমা করে আমাকে শিষ্য রূপে গ্রহণ করবেন। তাই আমি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সম্মতি নিতে চাই।" এই বলে তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কাছে গেলেন।

এর পূর্বে একদিন মহাপ্রভু "কোথায় পুণ্ডরীক! আমার বাপ পুণ্ডরীক? তুমি কোথায়? — এই বলে কাঁদতে থাকলেন। অন্যান্য ভক্তগণ এর কিছুই বুঝতে পারলেন না। তারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন, "কে এই মহাত্মা পুণ্ডরীক? যাঁর জন্য মহাপ্রভু এত ব্যাকুল?"

মুকুন্দ দত্ত পুণ্ডরীকের গ্রামবাসী বাল্যবন্ধু। তিনি বললেন, "পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ঐ গ্রামের জমিদার, ধনবান ও বিবাহিত গৃহস্থ।

গদাধর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে নিজ অপরাধ ক্ষালনের জন্য পুণ্ডরীকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার অনুমতি চাওয়াতে মহাপ্রভু তা সানন্দে অনুমোদন করলেন।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ব্রজলীলায় শ্রীমতী রাধারাণীর পিতা বৃষভানু মহারাজ, গদাধর পুণ্ডরীকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করলেন। তাই আমাদের বৈষ্ণবের বাহ্য আচার দেখেই তাঁর বৈষ্ণবতার মহত্ত্ব সম্পর্কে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন নয়।

শ্রীরূপানুগ-ধারা

নির্বিশেষবাদী আধ্যাত্মিক মার্গের প্রবক্তাগণ বলেন যে, আত্মা দেহ-সম্পর্ক থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়াই চরমসিদ্ধি, এর পরে আর কিছু উন্নত সিদ্ধির অস্তিত্ব নাই। কিন্তু শাস্ত্র বলেন, জীবাত্মা থেকে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ, তার উর্দ্ধে ভগবৎ প্রকাশ, এই ভগবৎতত্ত্ব বাসুদেব প্রকাশে আরম্ভ। এই বাসুদেব অপেক্ষা উচ্চতর বিকাশ নারায়ণ স্বরূপ, নারায়ণ অপেক্ষা কৃষ্ণস্বরূপের অধিক ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য বর্ত্তমান। সেই কৃষ্ণ আবার দ্বারকেশ, মথুরেশ ও ব্রজেশ কৃষ্ণ ভেদে ত্রিবিধ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের মতে কৃষ্ণই সর্বোচ্চ ভগবৎ প্রকাশ,—

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"

ব্রজ বা বৃন্দাবনের কৃষ্ণের যে প্রকাশ, তা সর্বোত্তম বলে শাস্ত্র স্বীকার করেছেন। তার কারণ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যই সর্বোত্তম। দৈহিক, মানসিক বৌদ্ধিক যা কিছু সদ্‌গুণ আছে, সর্বোপরি প্রেম, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের প্রভাব। ন্যায়ের চেয়ে দয়ার মহত্ত্ব অধিক। সাধারণ বিচারে ন্যায় সর্বোপরি, কিন্তু প্রেম ও দয়া তদুপরি। সমাজে ন্যায়ের সিদ্ধান্তকে রাজকীয় ক্ষমা বা দয়া অতিক্রম করে থাকে। ন্যায় বিচারের অবিচার দূর করে যে আদালত তার ন্যায়াধীশ একমাত্র কৃষ্ণ। তিনি সর্বদাই স্বকীয় লীলাপরিকরের সঙ্গে ক্রীড়া বা লীলাখেলায় ব্যস্ত। আমরা এই ক্ষুদ্র পাপি ব্রেন্ বা সামান্য-বুদ্ধি নিয়ে, সে লীলারহস্য ভেদ করতে পারি না।

ভক্তগণের মধ্যে উদ্ধবই শ্রেষ্ঠ বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। সেই উদ্ধবই বলেন,—

অহো বকী যং স্তনকালকুটং
জিঘাংসয়াপায় য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥

ভাঃ ৩।৩।২৩

তিনি বলেন, "কার কাছে আমি শরণ গ্রহণ করব। কৃষ্ণের চেয়ে এমন দয়ালু কে আর আছে? মাতার অভিনয় করে পূতনা স্তনে বিষমাখিয়ে কৃষ্ণকে হত্যা করতে গিয়ে নিজে হত হল। কিন্তু তার মত পাপীয়সীকেও একটু মাতৃত্বের অভিনয় মাত্র করেছিল বলে তাকে ধাত্রীর গতি পাইয়ে দিলেন। আমার কৃষ্ণ এত দয়ালু! এত উদার!

আমরা তাঁর দয়ার সীমা করতে পারি না, তুলনা করতে পারি না।

পূতনা ব্যাপারে ন্যায় থেকে দয়ারই প্রাধান্য প্রকটিত হয়েছে। নিজের আততায়ীর প্রতি একেবারে বিপরীত আচরণ এত বড় দয়া! — এর কি তুলনা হতে পারে? উদ্ধব এই চিন্তাকরে, কৃষ্ণের দয়ার কুল কিনারা না পেয়ে, তাঁর পায়ে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করেছেন। এই রকম দয়ার মূর্ত্তবিগ্রহ প্রেম ঘনবিগ্রহ কৃষ্ণের চরণে কেইবা প্রণত হবে না?

কৃপার ঘনত্ব

"যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার"

অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুচৈতন্য জীবের অনন্ত অসীম দয়াসাগর কৃষ্ণের চরণে এই প্রার্থনা হওয়া উচিত, — "কৃষ্ণ! যদি যোগ্যতা বিচার কর, ন্যায় বিচার কর, তবে আমার স্থান নাই, তাই সে দরবারে, ন্যায়ের দরবারে আমি যাব না। তোমার কৃপার সাগরতীরে দাঁড়াব তার ত' পারাপার নাই, ভাল-মন্দের যোগ্য অযোগ্যের বিচার নাই। আমার মধ্যে আছে, যাতে তোমার কৃপা পাব, তা ত' দেখি না। আমি এতই দীন, কাঙ্গাল, এতই অযোগ্য যে আমি কিসে ভাল হয়, তার কিছুই জানিনা। কাজেই ন্যায় বিচার আমি চাই না। তা করতে গেলে ত' কিছুই পাব না। যোগ্যতা বিচারেও তাই।

তাই আমি তোমার শরণ নিলাম, এখন আমার কি হবে না হবে, তা তোমার হাতে। তুমিই রক্ষাকর্ত্তা, আমাকে যদি কিছু উপায় থাকে তবে রক্ষা কর।

এই প্রকার আর্ত্তি, আত্মনিক্ষেপ, কার্পণ্য আমাদের হৃদয়কে নির্মল করে। এই শরণাগতি বা আত্মনিক্ষেপ দ্বারাই আমরা কৃষ্ণের কৃপাকটাক্ষ আকর্ষণ করতে পারি। কৃষ্ণপাদপদ্মে ফিরে যাওয়ার এই প্রকার শরণাগতিই একমাত্র পাথেয়।

এখন আমরা আমাদের অন্তরের অন্তরতম গুহায় যে প্রেমপিয়াসাকে সঞ্চিত রেখেছি, তা পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে আমরা বিচ্যুত হয়ে পড়েছি। সেই সৌভাগ্য যদি আমরা সহজে ও শীঘ্র পেতে ইচ্ছা করি, তাহলে আমাদের সরল স্বচ্ছ হৃদয়, খোলামন ও

অনাবৃত দেহ নিয়ে তাঁর চরণপ্রান্তে প্রণত. হতে হবে। শ্রীল রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখেছেন,—

মৎতুল্যো নাস্তি পাপাত্মা
নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে
কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম ॥

হে প্রভো! আমি একান্তই লজ্জিত, যেহেতু পবিত্র পদার্থই আপনাকে নিবেদন করা যায়, কিন্তু আমার ত' দুর্ভাগ্য, আমি কেবল কিছু মন্দ জিনিষই সঙ্গে নিয়ে এসেছি, এই আমার লজ্জা নিয়েই আমি তোমার কৃপাপ্রার্থনা করছি। আমার পাপ-অপরাধ-পূর্ণ জীবনের তুলনা আর নাই। যত কিছু মন্দ বলে কল্পনা করা যেতে পারে, সে সবই আমার মধ্যে রয়েছে। আমার জঘন্য পাপ ও অপরাধের কথা আমি নিজে উচ্চারণ করতেও লজ্জা পাই। তথাপি তোমার ক্ষমা সুন্দর স্বভাব, করুণা-ঘন বিগ্রহ আমাকে তোমার চরণে ঠেলে এনেছে। তুমি আমাকে রক্ষা করতে পার, আমাকে শোধন করতে পার। আমার কোন আশা না থাকলেও তথাপি আশাবন্ধ নিয়ে এসেছি। আমার একমাত্র ভরসা যে, আমিই তোমার কৃপার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। কারণ তুমিই ত' পতিতপাবন,

যে যত পতিত হয় তব কৃপা তত তায়
তাহে আমি সুপাত্র দয়ার,

আমি দীনের চেয়েও অতিদীন,— এইটিই আমার একমাত্র যোগ্যতা। আমার আশা তুমি যেহেতু অহৈতুকী কৃপাময়, তুমি আমাকে গ্রহণ করবেই।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রূপ গোস্বামী আরও বলেছেন,—

যুবতীনাং যথা যূনি
যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বন্
মনোঽভিরমতাং ত্বয়ি ॥

ভ: র: সি: ১।২।১৫১

যুবকের যুবতীর প্রতি এবং যুবতীর যুবকের প্রতি যে আসক্তি বিদ্যমান্, হে প্রভো তোমার প্রতি সেই আসক্তিই চাই। আমি জগতের সব কিছু বিস্মৃত হয়ে তোমাতেই নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাই। এইরূপ আন্তরিক শরণাগতির দ্বারাই আমাদের পারমার্থিক

উন্নতি আরম্ভ হয়। এবং এই প্রকার আকর্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে আমরা সেইরূপ উন্নতস্তরে পৌঁছাতে পারব। হে প্রভো! আমি তোমার সঙ্গে সেইরূপ প্রীতি বন্ধন চাই। আমি একান্ত অকিঞ্চন হলেও আমার ত' সেই লালসাই রয়েছে। তা ব্যতীত আমি জগতের সব কিছুর প্রতি একান্ত বীতশ্রদ্ধ হয়েছি। আমি তোমাকে অতি নিবিড়ভাবে পেতে চাই। এই মনোভাব দ্বারাই শরণাগতির প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে ধীরে ধীরে উন্নতস্তরে যেতে থাকে।

আমি সেই প্রকার ঘনিষ্ঠ প্রেমসম্বন্ধ তোমার সঙ্গে চাই। আমি তোমার ভিতরই মজে যেতে চাই।

গোবিন্দবল্লভে রাধে
প্রার্থয়ে ত্বামহং সদা।
ত্বদীয়মিতি জানাতু
গোবিন্দ মাং ত্বয়া সহ॥

এই প্রার্থনা গোপাল ভট্ট গোস্বামীর রচিত হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের অন্তর্গত অর্চ্চন পদ্ধতি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

শাস্ত্রে সবই রয়েছে। এটি চিরন্তন প্রবাহ— এক বিশেষ বিজ্ঞান ধারার। বৈকুণ্ঠও গোলোকে সবই নিত্য। সূর্য্য যেমন উদয় হন, অস্ত যান, সেই প্রকার শাস্ত্রের এই অমৃতপ্রবাহ কখনও দৃশ্য হয়, কখনও অদৃশ্য হয়ে থাকে।

এই শ্লোকে 'গোবিন্দবল্লভেরাধে'— হঠাৎ একটা মোড় নেয়। কৃষ্ণ তাঁর ভক্তকে বলেন, "তুমি আমার নিবিড় সম্বন্ধ চাও? তা ত' আমার সেরেস্তায় নাই। আর একটা বিভাগে যেতে হবে। শ্রীরাধার দপ্তরে যাও।"

তার পরে ভক্তের চিন্তা সেই দিকেই ছুটে। সব শক্তিত' সেইখানেই জমা রয়েছে। এত' তাঁরই একারই অধিকার। কৃষ্ণ বলেন, তোমার লালসাতৃপ্তি ত' আমার দপ্তরে নাই। সেখানে যাও আবেদন জানাও।"

এতেই ভক্ত উৎসাহিত হয়ে শ্রীমতী রাধারাণীর কাছে আবেদন পেশ করে, "ও গোবিন্দবল্লভে রাধে! তুমিই ত' গোবিন্দের বল্লভা, তার হৃদয়, তাঁর প্রভু, তাঁর জীবাতু।"

'গোবিন্দ' অর্থ যে আমাদের সমগ্র ইন্দ্রিয়কে সংতৃপ্ত করে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই ত' আমরা সব অনুভব করি, জ্ঞান লাভ করি। গোবিন্দের দ্বারাই ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সবকয়টী ধারা পরিপূর্ণ হয়।

"সেই গোবিন্দ তোমার হৃদয়নিধি। তুমিই গোবিন্দের হৃদয়ের রত্ন, তাঁর সদারাধ্যা,

তাই নয়? তুমিই তাঁর হৃদয়েশ্বরী তিনি আমাকে তোমার কাছেই পাঠিয়েছেন আমার আবেদন, বিজ্ঞপ্তি স্বীকার করে তোমার সেবিকাগোষ্ঠীর একজন করে নাও।" "ও রাধে! বৃন্দাবনেশ্বরী! তুমিই ত' কৃপার অমৃতধারা। আমার প্রতি দয়া কর, তোমার রাঙ্গাপায়ের একটুখানি সেবা দাও।"

"তুমিই যে রাসোৎসবের মুখ্যা— রাসেশ্বরী।" রাস অর্থ রসের অনন্তপ্রবাহ. বৃন্দাবনের এইটিই বিশেষ সম্পদ— আদিরস, মাধুর্য্যরস, বা যুগলপ্রেমরস। অন্যান্য সব রসই এই মুখ্যরসের আধার। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সবরসই মাধুর্য্যরসের মধ্যে রয়েছে, আর ভক্তিতে মাধুর্য্যরসই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তি।

রায় রামানন্দের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিশ্রাভক্তিকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বললেন,

"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।" — এ বহিরঙ্গ, আগের কথা বল।

মহাপ্রভুর প্রকৃত ভক্তি জ্ঞানমিশ্রাভক্তির উর্দ্ধে, আর তা জ্ঞানশূন্যা ভক্তি থেকেই প্রকৃত ভক্তির আরম্ভ।

যখন রামানন্দ দাস্যরসের কথা বললেন, মহাপ্রভু বললেন, হাঁ—

"এহো হয়, আগে কহ আর।" তারপরে সখ্যরস কথা রামনন্দ বললেন, মহাপ্রভু, সেই "এহো হয় আগে কহ আর।" সখ্যের চেয়ে আর শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?

রামানন্দ তখন বললেন,— "হাঁ, বাৎসল্যরস।"

মহাপ্রভু বললেন,— "হাঁ, এহ উত্তম, আগে কহ আর।"

তার পরে তিনি মাধুর্য্য রসের উল্লেখ করাতে মহাপ্রভু বললেন,— এইরসই সর্বশ্রেষ্ঠ। আর রসের এই সর্বোচ্চ পর্য্যায় কেবলমাত্র বৃন্দাবনেই প্রকটিত হয়।

বৃন্দাবনেই মাধুর্য্যরসের প্রাচুর্য্য। তাই বলা হয়, রাধে বৃন্দাবনাধীশে! তুমিই সেই রহঃলীলার ঈশ্বরী, আর তা কেবল বৃন্দাবনেই পাওয়া যায়। তুমিই সেই অমৃত প্রবাহ।

মাধুর্য্য বিতরণ

কৃষ্ণের স্বভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনিই মাধুর্য্যরস বিগ্রহ— রসরাজ। তিনি নিজের মাধুর্য্য নিজেই আস্বাদন করেন। তিনি নিজমাধুর্য্য জানেন, কিন্তু তাকে বিতরণ করতে একটী বিশিষ্ট শক্তি অপরিহার্য্য আর তাই "হ্লাদিনী", হ্লাদিনীর সার হল শ্রীরাধিকা

এবং তিনিই কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি, তিনিই রসনির্য্যাস কৃষ্ণ থেকে আকর্ষণ করেন এবং অন্যকে বিতরণ করতে পারেন।

তাই বলা হয়েছে— "করুণামৃত বাহিনী"! মাধুর্য্য ঔদার্য্য মিশে সেই উৎস থেকেই প্রবাহিত, যেমন একটী নদী পর্বত শিখর থেকে বেরিয়ে তার স্রোতের সঙ্গে বহু উপাদেয় দ্রব্য বয়ে নিয়ে জগৎকে বিলিয়ে দেয়, সেই রকম হ্লাদিনী শক্তি রসস্বরূপ থেকে রস নিয়ে বহন করেন। কৃষ্ণ স্বয়ং রসস্বরূপ - রসরাজ - রসবিগ্রহ। তাঁর রস ও আনন্দ একত্র মিশিয়ে তাঁর সঙ্গে মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য দিয়ে অন্য ভক্তকে বিতরণ করা।

তারপরে ভক্তের চিত্তে আর একপ্রকার অনুভাব প্রকটিত হয়। সে তখন অনুভব করে, "কৃষ্ণ আমার কাছে গৌণ, আমার মুখ্য সম্পর্ক তোমার সঙ্গেই, রাধে! আমি কৃষ্ণের সাক্ষাৎসেবা চাইনা তোমার আনুগত্যবিনা।"

শরণাগত চিত্তে শ্রীরাধারাণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব এইভাবে প্রকটিত হয়। তার ফলে রাধারাণীর নিকটতম হিসাবে সে নিজ গুরুদেবকেই দেখে এবং তাঁর আশ্রয়ে রাধারাণীর সেবাসৌভাগ্য পেতে চায়। তখন সাধকশিষ্য ভাবে, "আমি গুরুদেবের আনুগত্যেই সর্বোচ্চ সেবা পাব, তাতেই আমার সিদ্ধি।"

শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে যোগযুক্ত করাবার দায়িত্ব গুরুদেবেরই। গুরুদেবই সেই সেবিকাদের সঙ্গে অনুকূল ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা করে থাকেন।

তাই গুরুদেবের সেবায় আমাদের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভুত হওয়া দরকার। আমরা কৃষ্ণকে চাই। কিন্তু সে যোগ্যতা ত' আমাদের নাই। প্রথম উপলব্ধি হচ্ছে নিজের অযোগ্যতা, কৃষ্ণ মাধুর্য্যের আকর, আর আমরা এক বিশেষ মাধুর্য্যের আকাঙক্ষী। তা পেতে হলে বিশেষ বিভাগের কাছেই আবেদন করতে হবে। সেখানেই আমাদের নিত্য-স্থিতি প্রয়োজন। সেই কথাই শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে ষোল বৎসর যাবৎ বাস করেছিলেন তাঁদের অপ্রকটের পর শ্রীল দাস গোস্বামী জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে বৃন্দাবনে চলে গেলেন। সেখানে তিনি যখন রূপ ও সনাতন গোস্বামীর সাহচর্য্য লাভ করলেন, তখন তিনি জীবনের এক নূতন স্বাদ অনুভব করলেন। এক নূতন জীবন লাভ করলেন। সেখানে তিনি অনুভব করলেন, যদিও শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও স্বরূপ দামোদর স্থূল দৃষ্টির বাহিরে চলে গিয়েছেন, তবুও তাঁরা শ্রীরূপ সনাতনের মধ্যে এখনও এখানে প্রকট রয়েছেন তাঁদের ক্রিয়া-কলাপ, আচরণ, প্রচার ও গ্রন্থরচনার মধ্যে

মহাপ্রভু যেন সাক্ষাৎ লীলা করছেন। তিনি জীবন ত্যাগের চিন্তা ছেড়ে দিলেন, এক নূতন উদ্দীপনায় বৃন্দাবনে ভজন করতে আরম্ভ করলেন।

এই শ্রীদাস গোস্বামী জীবনের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছাবার রহস্য উন্মেচন করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,— "হে রাধে! আমি তোমার সেবাই চাই, তুমি যদি সন্তুষ্ট না হও, আমি কৃষ্ণকেও চাই না, বৃন্দাবনবাসও চাই না।"

এই তাঁর প্রার্থনা এবং তিনি "প্রয়োজনাচার্য্য" বলে আমাদের সকলের পূজ্য। জীবনের চরম সিদ্ধিদাতা গুরুরূপে তিনি আরাধ্য, প্রয়োজনতত্ত্বের আচার্য্য শ্রীল দাস গোস্বামী নিম্নশ্লোকেই তাঁর স্থিতি দেখিয়ে দিয়েছেন,—

রসামৃতসিন্ধু

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালোময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বং চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈ র্ব্রজেন চ বরোরু! বকারিণাপি ॥

এই শ্লোকটি শ্রীরাধারাণীর চরণেই প্রার্থনা। এতে এমন একটি আশাবন্ধ প্রকটিত হয়েছে, যাকে রসামৃতসিন্ধু বলা হয়েছে। তিনি বলেন, এই আশাতেই আমি এ যাবৎ কোনরূপে বেঁচে আছি। ঐ একটি আশাতেই আমি আমার দিনগুলোকে কোনরকমে কাটাচ্ছি, জীবনটাকে টেনে চলেছি। ঐ আশাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে সেই আশামৃতের বিন্দু আমাকে টেনে রেখেছে, তাই কোনমতে বেঁচে আছি মাত্র।

তা না হলে, আমি মহাপ্রভুকে, স্বরূপদামোদরকে, অন্যান্য মহাপুরুষগণকে হারিয়ে যে বেচে আছি, তা কি জন্য? সেই আশায়ই ত' ধৈর্য্যের শেষ সীমায় পৌঁচচ্ছি, আর ত' পারিনা! এই মুহূর্ত্তে তুমি যদি কৃপা না কর, আমি ত' শেষ হয়ে যাব। আর বেঁচে থাকার কোন মূল্যই থাকবে না। সবই বৃথা হয়ে যাবে।

তোমার কৃপা ছাড়া আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচব না, আমার এত প্রিয় বৃন্দাবন, আমার জীবন, সবই তুচ্ছ। সবই যেন আমাকে সূচীবিদ্ধ করছে। এসবই ত' দূরের কথা, আমি কৃষ্ণকেও চাই না, তুমি যদি তোমার সেবিকা গণের একজন করে আমায় না নিয়ে যাও, তবে আমি কৃষ্ণের ভালবাসাও চাই না। তোমার ঐ রহঃসেবাদাসীগণের সেবার কি মাধুর্য্য তার ত' একটু আস্বাদ আমি পেয়েছি, সে আস্বাদ পাওয়ার পর আর সবই স্বাদহীন হয়ে গিয়েছে আমার কাছে। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর প্রার্থনা এই রকম।

শ্রীমতী রাধারাণীর সেবা

তাই রাধাদাস্য— শ্রীমতী রাধারাণীর সেবিকাভাবই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মতে সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি। এইটিই শ্রীমদ্‌ভাগবতের সারনির্য্যাস। একথা কৃষ্ণ নিজেই বলেছেন,—

> ন তথা মে প্রিয়তমো
> আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
> ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রী-
> র্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥

ভাঃ ১১।১৪।১৫

হে উদ্ধব! ব্রহ্মা, শিব, বলদেব, লক্ষ্মী, এমন কি আমার নিজের স্বরূপও তোমার চেয়ে আমার প্রিয় নয়। এই উদ্ধব যিনি কৃষ্ণের এত প্রিয়, তিনিই শ্রীরাধারাণী ও ব্রজগোপীদের প্রশংসা করে বলছেন,—

> আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
> বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
> যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
> ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥

ভাঃ ১০।৪৭।৬১

"বৃন্দাবনের গোপীগণ তাদের স্বামী, গুরুজন, আত্মীয়স্বজন, এমন কি নারীর সতীত্বধর্মও কৃষ্ণের সঙ্গ লাভের জন্য বিসর্জন দিয়েছিলেন, যে কৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন আশায় বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি শ্রুতিগণ তপস্যা করেছিলেন। হে কৃষ্ণ! সেই ব্রজগোপী-গণের পদধূলি পাওয়ার জন্য যাতে আমি তৃণ-গুল্মরূপে জন্মগ্রহণ করতে পারি, সেই আশীর্বাদ কর।"

শ্রীরাধার অন্বেষণে

গোপীগণের মহত্ত্ব উদ্ধব এইভাবে প্রতিপাদন করেছেন। সেই গোপীগণের সঙ্গে শ্রীমতী রাধারাণীর যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আছে, তা রাসলীলায় প্রমাণিত হয়েছিল।

যখন রাসমণ্ডলে কৃষ্ণ ও ব্রজগোপীগণ হৃদয়ের উদ্‌বেলনে সবদিক্ উন্মাদ করে তুলেছিল, তখন শ্রীমতী রাধারাণীও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। রাসনৃত্যে শ্রীমতী রাধারাণীই পরকীয়া প্রীতির মাধুর্য্যরসের চরম পরিপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, তার পরে তাঁর এই চিন্তা

উদিত হল— "আমি কি তাই এদের মধ্যে কেবল একজন মাত্র? আমার কোন বৈশিষ্ট্যই নাই এই রূপ মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফলে তিনি হঠাৎ রাসমণ্ডল পরিত্যাগ করলেন। নৃত্য ও সঙ্গীতের চরম মূর্চ্ছনার মধ্যে তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কৃষ্ণ যখন দেখলেন, রাধারাণী নাই, তখন সমগ্র রাসলীলাই তাঁর কাছে নীরস হয়ে উঠল, যদিও রস সেখানে ছিল, কিন্তু তার স্বাদ ছিলনা, কৃষ্ণ এটা অনুভব করে ভাবলেন — কেন এমন হল? তিনি ভাবের তরঙ্গে ভাটা পড়তে অনুভব করলেন, তখন তিনি দেখলেন, শ্রীমতী রাধারাণী সেখানে নাই। তখন তিনি বিমনা হয়ে রাসমঞ্চ ছেড়ে দিয়ে রাধারাণীকে খুঁজে বেড়াতে বেরিয়ে গেলেন।

বৃন্দাবনে পরকীয়ার রস মাধুর্য্য যদিও সর্বাধিক, তথাপি তা অন্যান্য গোপী ও রাধারাণীর অনুগতা গোপীদের মধ্যে একপ্রকার নয়। শ্রীমতী রাধারাণীর স্ব-গোষ্ঠীতে পরকীয়া প্রীতির মাধুর্য্যের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

পরিমাণগত ও গুণগত বৈশিষ্ট্য শ্রীরাধারাণীর গোষ্ঠীতেই অধিক। এই বৈশিষ্ট্যকে দেখাতে গিয়ে শ্রীজয়দেব গীতগোবিন্দ কাব্যে কৃষ্ণ কিজন্য রাসমণ্ডল ছেড়ে গেলেন তা বর্ণনা করেছেন,—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধ শৃঙ্খলাং।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দর্য্যঃ ॥

কৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীকে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গেই নৃত্যকরতে চেয়েছিলেন। তাই রাধার অবর্ত্তমানে তিনি রাসমণ্ডল তথা অন্যান্য সব গোপীদের ছেড়ে চলে গেলেন। জয়দেবের বর্ণনায় দেখা যায়, কৃষ্ণ যেন রাধারাণীকে হৃদয়ের মধ্যে নিয়েই রাসমণ্ডল ত্যাগ করলেন।

কৃষ্ণ রাধারাণীকে খুঁজে বের করতে চলে যাওয়াতে, রাধারাণীর মহত্ত্ব কত তা সহজেই বোঝা যায়।

কৃষ্ণের প্রেমতৃষ্ণা এত সহস্র গোপীর দ্বারাও তৃপ্ত হতে পারে নাই। তাই তিনি চলে গেলে রাধারাণীর প্রীতি কত গাঢ়, কত নিবিড়, তাই বোঝা যায়,—

"শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্বাপণ"

অন্যান্য গোপীগণ সংখ্যায় ত'অনেক ছিল, কিন্তু গুণগত বিচারে তাদের সকলকে মিলিয়ে দেখলে একা রাধারাণীই সব চেয়ে প্রেমময়ী প্রমাণিত হন।

রূপানুগ সম্প্রদায়ের এইখানেই বিশেষত্ব যে, তাঁরা রাধারাণীর গোষ্ঠীপ্রতিই বিশেষরূপে পক্ষপাতী, সেখানে জড় জগতের ভোগ-কামনা, বা আধ্যাত্মিক রাজ্যের ত্যাগ-স্পৃহা এমনকি শাস্ত্রীয় বৈধীভক্তিমার্গেরও স্থান নাই। সর্বোচ্চ স্তরের প্রেমভক্তি কোন বিধি-নিষেধ গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। তা সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত। এই প্রীতিতেই চরম ত্যাগস্বীকার সম্ভব। শ্রীরাধারাণীর গোষ্ঠীতেই প্রেমের সার মহাভাব গচ্ছিত হয়েছে। তা অন্যকোন সিদ্ধির সঙ্গে তুলনাই হতে পারে না।

এর পরে আর একটি স্তর আছে, যার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। কেন আমরা শ্রীমতী রাধারাণীর গোষ্ঠীর এত পক্ষপাতী, তার কারণ হল, শ্রীরাধারাণীর গোষ্ঠীতেই কৃষ্ণকে আমরা সর্বাপেক্ষা নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ দেখতে পাই— এই জন্যই কি?

আমরা কি কেবল কৃষ্ণকে চাই? না আমরা কৃষ্ণকে চাই না। আমরা রাধারাণীর সেবাই চাই। কেন? রাধারাণীর সেবায় কি বিশেষ রস পাওয়া সম্ভব?

আমরা কৃষ্ণের ডাইরেক্ট সেবা যদি পাই, তাতে আমাদের লোকসান্ হবে। রাধারাণীর কৃষ্ণ সেবাই সর্বোচ্চ। তাই রাধারাণী সেবায় যদি আমরা সহায়তা করি, তা হলে তিনি আরও ভালভাবে কৃষ্ণের সেবা সম্পন্ন করতে পারবেন। এর প্রতিদান রাধারাণীর মাধ্যমেই আমাদের নিকট আসবে এবং সেই প্রতিদান হল মহাভাব।

তাই রাধারাণীর সখীগণ কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসতে চায় না। তারা তা এড়াতে চায়। তথাপি রাধারাণী নানা ছল করে সখীদের কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ মিলন করাতে থাকেন, কারণ এইটিই রাধারাণীর আন্তরিক কামনা। তথাপি সখীগণ তা চায় না। এই কথাই চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে।

রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প-পাতা ॥

চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২০৯

শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতিকা, গোপীগণ হল তার পত্র-পুষ্পাদি। শ্রীমতী রাধারাণী রূপ কল্পলতিকা থেকেই পত্র-পুষ্পাদিরূপ সখীদের উৎপত্তি। রাধারাণী সেই কল্পবৃক্ষের কাণ্ড, আর সখীগণ তার শাখা-প্রশাখা।

এর পরে আর একটি উচ্চতর বিচার রয়েছে। আমরা নিজেকে রূপানুগ বলে পরিচয় দিয়ে থাকি, কারণ আমরাও শ্রীরূপের শাখা-প্রশাখা।

শ্রীমতীরাধারাণীর সেবা কেবল কৃষ্ণই পান। এমন কি নারায়ণও না। আবার দ্বারকেশ ও মথুরেশ কৃষ্ণও রাধারাণীর সেবা পাননা।

পুনশ্চ বৃন্দাবনেও অন্যান্য গোপী গোষ্ঠী অপেক্ষা রাধারাণীর গোষ্ঠীর মহত্ত্ব অধিক। তার মধ্যেও আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে।

শ্রীরূপ গোস্বামী— রূপমঞ্জরী

শ্রীরূপ কে? রূপমঞ্জরী। সাধারণত পারমার্থিক গোলোক বৃন্দাবনেও শ্রেণীবিভাগ রয়েছে— এই উচ্চ, উচ্চতর ইত্যাদি শ্রেণী বিভাগও সেখানে নিত্য। যারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে, তারা সিদ্ধদেহে মঞ্জরীর অনুগতা কোন গোপী রূপে সেবা সৌভাগ্য পায়। শ্রীরাধারাণীর সেবিকা যে মঞ্জরী গোষ্ঠী রয়েছে, তাদের মধ্যে শ্রীরূপমঞ্জরীই সর্বশ্রেষ্ঠা। শ্রীরাধার সখী সম্প্রদায়ে মঞ্জরীদের বিশেষ অধিকার আছে।

শ্রীরাধার যত সখী আছেন, তাদের মধ্যে কেউ তাঁর চেয়ে বয়সে একটু বড়, অন্যেরা একটু বয়স্কা। শ্রীরাধাগোবিন্দের নিভৃত মিলন কুঞ্জে সখীরা প্রবেশ করে না। কারণ তাতে তাঁরা লজ্জা অনুভব করতে পারে। কিন্তু যারা মঞ্জরী, তারা খুব অল্পবয়স্কা, তাই সখীরা সেই রাধাগোবিন্দের মিলন প্রকোষ্ঠে যে সব সেবার দরকার হয়, তাঁরা নিজে প্রবেশ না করে ক্ষুদ্র বালিকা বয়সী মঞ্জরীদের পাঠিয়ে বিভিন্ন রহঃসেবা করিয়ে থাকেন।

শ্রীরাধার সখীগণের মুখ্যা ললিতা ও বিশাখা। তার মধ্যে ললিতাই বিশেষ সহায়কারিণী। অন্যান্য সখী ও মঞ্জরীবর্গ ললিতার নির্দ্দেশেই বিভিন্ন সেবা করে থাকেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের নিভৃত মিলন কক্ষে ঐ অল্পবয়স্কা মঞ্জরীদের অবাধ প্রবেশ দ্বারা রাধাগোবিন্দের চরম আশ্লেষ মাধুরী আস্বাদনে কোন ব্যাঘাত হয় না, তারা সঙ্কোচ বোধ করেন না। এই মঞ্জরীগণের মধ্যে রূপ মঞ্জরীই সর্বমুখ্যা। রাগানুগা প্রেমভক্তি মার্গের যে সাধকগণ ঐ মঞ্জরীগণের সেবা-সৌভাগ্য সাধনা ও সিদ্ধি লাভ করেন, তারা যদি রূপমঞ্জরীর অনুগত গোষ্ঠীতে যোগ দেবার সৌভাগ্য পান, তবে তারাই সব চেয়ে ভাগ্যবান্।

শ্রীরূপ মঞ্জরীই শ্রীরূপ গোস্বামীরূপে আবির্ভূতা। আমরা রূপানুগ সম্প্রদায় সেই পরম সেবা সৌভাগ্যাকাঙ্ক্ষী। আমাদের তার নীচে কোন সেবা আকাঙ্ক্ষাই নাই। তাই আমরা সেই চরম সিদ্ধির জন্য যা সাধনা আবশ্যক, তাই করে যেতে চাই। আমাদের অন্য সিদ্ধি বা আকাঙ্ক্ষা নাই। এর নীচে অন্য কোন সিদ্ধি আমরা চাই না— পেলেও গ্রহণ করব না। শ্রীরূপানুগ ধারার এইটিই একমাত্র বৈশিষ্ট্য।

পারমার্থিক উত্তরাধিকার

আমরা যখন নাবালক, তখন যদিও আমাদের পূর্বপুরুষ বহুসম্পত্তি ও তার দলিল, কাগজপত্রাদি রেখে গিয়েছেন, আমরা হয় ত' সেসব বুঝে নেওয়ার উপযুক্ত হই নাই। কিন্তু যখন সাবালক হই, তখন ঐ সমস্ত দলিলাদি ও সম্পত্তি উত্তরাধিকারীরূপে বুঝে নিই ও তার মালিক হয়ে থাকি।

আমাদের গুরুবর্গ আমাদের জন্য রাগানুগা প্রেমভক্তি মার্গের বহু শাস্ত্র-গ্রন্থ রচনা করে আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন আমরা ভক্তিরাজ্যে যতই উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হই, সেই সব শাস্ত্র-গ্রন্থ অধিকারানুরূপ অনুশীলন করা প্রয়োজন। আমাদের জানা দরকার যে, আমরা সেই শাস্ত্র-সম্পদ, সাধন-সম্পদের ন্যায্য-অধিকারী, তা ত' আমাদের পৈতৃক সম্পদ। আমরা এখন নাবালক হতে পারি, অযোগ্য হতে পারি, কিন্তু যেহেতু সেই বংশে বা সেই রূপানুগ পরম্পরার সম্বন্ধ স্বীকার করেছি, ঐ সম্পদ-প্রাপ্তির জন্য যোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা আমাদের আছেই।

আমাদের গুরুদেব আমাদের তার সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন, তার চাবিকাঠিও আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। এখন আমাদের কাজ হল, সেই চাবিকাঠি নিয়ে আইরন চেষ্ট খুলে সেই মূল্যবান অলংকার গুলো গ্রহণ করা।

অনেকেই আমাদের অনধিকারী ভেবে বলতে পারে— এরা পৃথিবী ছাড়িয়ে একেবারে আকাশ থেকেই ইলেকট্রিক নিতে চায়।

আমাদের গুরুবর্গ চাতক পক্ষীর মত। চাতক তৃষ্ণা পেলে সেই আকাশের জলবিন্দুর দিকে তাকিয়ে থাকে। পৃথিবীর বক্ষে হাজার জলাশয় থাকলেও তা থেকে সে জল গ্রহণ করে না। শ্রীল রূপ গোস্বামী এই চাতকের মত নিজের আর্ত্তি কৃষ্ণের কাছে জানিয়েছেন।

করুণাবারিবিন্দু

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াম্বা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটিনির্ভরং বা নবাম্ভ
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন।

শ্রীরূপপাদানাং

হে মেঘ! তুমি আমাকে দন্ড দিতে পার, বজ্রপাত করে আমাকে শেষ করতে পার,

আর প্রচুর জলও দিতে পার। তোমা ভিন্ন আমার অন্য কোন গতি নাই।

আকাশের দিক্ থেকে যাই আসুক, চাতক পাখীর অন্য কোন গতিই নাই।

সেইরূপ রূপ গোস্বামী বলছেন,— "কৃষ্ণ! তুমি আমাকে শেষ করতে পার। আর একবিন্দু কৃপাবারি দিয়ে রক্ষা করতেও পার। আমি তোমাছাড়া আর কাউকেই চাইনা, আর সেই কৃপা বারিবিন্দু ছাড়া অন্য কিছুই চাই না। তোমা ছাড়া আমার অন্য গতি নাই।"

আমরা সেই রূপানুগ ধারার করুণাবারিবিন্দু ব্যতীত অন্য কোন সাধন বা সিদ্ধি কামনা করিনা। জগতে অনেক সাধন অনেক সিদ্ধি রয়েছে। আমরা কিন্তু চাতকের মত উর্দ্ধাকাশের সেই রাগানুগামার্গের করুণা বিন্দু কামনা করি। রূপানুগ গুরুবর্গের শ্রীচরণে আমাদের এই মাত্র প্রার্থনা।

—ঃ গ্রন্থ সমাপ্তঃ—

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী ঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (সম্পাদিত)
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ (সম্পাদিত)
শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্
শ্রীপ্রেমধাম-দেব-স্তোত্রম
অমৃতবিদ্যা (বাংলা ও উড়িয়া)
শ্রীশিক্ষাষ্টক
সুবর্ণ সোপান
শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা

The Search for Sri Krishna : Reality the Beautiful
(Eng. Spanish Hungari, Itali & Swedish)
Sri Guru and His Grace (English, Spanish, Russin Bengali)
The Golden Volcano of Divine Love
Bhagavad Gita : The Hidden Treasure of The Sweet Absolute
Loving Search for the Lost Servant (Eng., Spanish)
Positive & Progressive Immortality
(Prapanna Jivanamritam)
Sermons of the Guardian of Devotion
(Vol. I. II. III. & IV)
Subjective Evolution
The Mahamantra,
Golden Stair Case,
Holy Engagement

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ থেকে প্রকাশিত ও প্রাপ্তব্য অন্যান্য গ্রন্থাবলী

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
শ্রীগৌড়ীয় গীতাঞ্জলী
শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ
শ্রীনামতত্ত্ব নামাভাস ও নামাপরাধ বিচার
শ্রীনাম ভজন বিচার ও প্রণালী
শরণাগতি
কল্যাণকল্পতরু
The Bhagavata

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের ও তাঁর সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী

Benediction Tree of Divine Aspiration
Divine Guidance
Divine Messege for the devotees
The Divine Servitor
Dignity of the Divine Servitor

Sri Chaitanya Saraswat Math

CENTRAL TEMPLE AND MISSION:

Sri Chaitanya Saraswat Math, Kolerganj, P.O. Nabadwip, District Nadia, W. Bengal, PIN 741302, INDIA.
Tel: 40086 & 40752

BRANCH MISSIONS of SRI CHAITANYA SARASWAT MATH:

India: **Sri Chaitanya Saraswat Math,** Gaur Batsahi, P.O. Puri, Orissa 752001. Tel: 06752-23413

India: **Srila Sridhar Swami Seva Ashram,** Dasbisa, P.O. Govardhan, Dist. Mathura, U.P. 281502. Tel: (0565) 81 2195 & (0565) 85 2195

India: **Sri Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha,** Opposite Tank 3, 487 Dum Dum Park, Calcutta 700 055.
Tel: (33) 551 9175

U.S.A.: **Sri Chaitanya Saraswat Sevashram,** 2900 N. Rodeo Gulch Rd., Soquel, CA 95073. Tel: (408) 462 4712

U.S.A.: **Sri Chaitanya Saraswat Math,** 883 Cooper Landing Road, Suite 207, Cherry Hill, NJ 08002. Tel: (609) 962 8888

U.S.A.: 10884 Andrews Drive, Allen Park, MI 48101.
Tel: (313) 928 0620

U.S.A.: **Sri Chaitanya Saraswat Math,** 330 N.E. 130th Street, Miami, Fl 33161. Tel: 305- 8952029

U.S.A.: **Sri Giridhari Ashram,** P.O. Box 1238, Keaau, Hawaii, Hi 96749. Tel: (808) 968 8896

U.S.A.: **Sri Chaitanya Sridhar Govinda Mission,** RR1 Box 450-D, Crater Road,Kula, Maui, Hi 96790. Tel: (808) 878 6821

Mexico: **Sri Chaitanya Saraswat Ashram de Mexico, A.R.,** Calle 69-B #537, por 58-B, Fracc. Sta. Isabel, Merida, Yucatan.

Mexico: **Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Mission,** Reforma 864, Sector Hidalgo, Guadalajara, Jalisco. Tel: (36) 269613

Mexico: **Sri Chaitanya Saraswat Krishnanushilana Sangha,** Calle Jupiter # 1523, Col. Nueva Lindavista, Guadalupe, Nuevo Leon.

Mexico: **Sri Chaitanya Saraswat Ashram de Mexico, A.R.,** SGAR/363/93, Constitucion 951-25, Tijuana, B.C.

Venezuela: **Sri Rupanuga Sridhar Ashram,** Calle Orinoco, Ramal 2, Quinta No.16, Colinas de Bello Monte, Caracas.
Tel: 752 5265 Fax: 563 9294

Ecuador: **Srila Sridhar Swami Seva Ashram,** Lotización Armenia, Autopista General Rumiñahui cien metros pasando la entrada a Conocoto, P.O. Box 17-01-576, Quito. Tel: 408439

Colombia: Carrera 11A No. 96-42, Apto 201, Bogota-8. Tel: 2560793

Brazil: Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Asan, Rua Mario de Andrade 108, Caucaia Do Alto-Cotia, Sao Paulo - CEP 06720-000.
Tel: (011) 721 1109

Brazil: Sri Sri Gaura Nitai Ashram, Av. Anita Garibaldi 6499, Barreirinha, Curitiba, Parana, CEP 82 220-000.

U.K.: Sri Chaitanya Saraswat Math, 15 Gladding Rd., Manor Park, London E12 5DD. Tel. & Fax: (081) 478 2283

Ireland: Sri Chaitanya Saraswat Math, 3, Abercorn Square, Inchicore, Dublin 8. Tel: 450 4945

Italy: Sri Chaitanya Sridhara Sangha, Via. Dandolo 24, Int. 41/Scala B, 00153 Roma. Tel: 5899422

Netherlands: Sri Chaitanya Sridhara Sangha, Nieuw Westerdokstraat 122, 1013 AG Amsterdam Centrum. Tel: (020) 626 6945

Netherlands: Sri Chaitanya Saraswat Ashram, Middachtenlacan 128, 1333 XV Almere Buiten.

Czech Republic: Sri Chaitanya Saraswat Sangha, P.O. Box 44, 25263 Roztoky u Prahy.

Denmark: Sri Chaitanya Saraswat Sangha, Olivenvej, 43, 6000 Kolding.
Tel: 7550 3253

Germany: Sri Chaitanya Saraswat Ashram, Willibald-Alexis-Str.20, 10965, Berlin. Tel & Fax: 6919 320

Hungary: Pajzs utca 18. H—1025 Budapest. Tel: 361- 2121917

Sweden: Lundbergsgatan 7b, 217 51 Malmo.

Russia: 192 238 St. Petersburg, Bela-Kuna Street 12-24.
Tel: (812) 268 04 45

Mauritius: Sri Chaitanya Saraswat Math, Ruisseau Rose Road, Long Mountain.

Mauritius: Sri Sri Nitai Gauranga Mandir, Near Social Welfare Centre, Valton Road, Long Mountain.

South Africa: 57 Silver Rd., New Holmes, Northdale, Pietermaritzburg, Natal 3201. Tel: 0331 912026

South Africa: P.O. Box 60183, Phoenix 4068, Natal. Tel: 408 5001576

Australia: Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Mission,
Lot 15, Beltana Drive, Terranora, N.S.W. 2486. Tel: 75 904371

New Zealand: c/o Frank Pinter, Postal Delivery Centre, Waimauku, Aukland. Tel: 411 7022

Malaysia: Sri Chaitanya Saraswat Sadhu Sangham, 932 Taman Bernam, Tanjong Malim, Perak 35900. Tel: 05-496942

Malaysia: Sri Chaitanya Saraswat Sadhu Sangham, 7 Taman Thye Kim, Jalan Haji Mohamed Ali, 32000 Sitiawan, Perak. Tel: 05-6915 830

Philippines: Srila Sridhar Swami Seva Ashram, #23 Ruby St., Casimiro Townhouse, Talon I, Las Pinas, Metro Manila.

ভুল করাই মনুষ্যপ্রকৃতি। সকল অপূর্ণ জীবের পক্ষে
ভুল অনিবার্য্য। কিন্তু কেউই অপূর্ণ থাকতে
চায় না। সকল জীবেই এমন এক
উপাদান বর্ত্তমান, যার জন্য
সকলেই পূর্ণতার প্রতি
আগ্রহশীল। তা যদি
না হোত, তা'হলে
আমরা আদৌ
কোন অভাব বোধ করতে
পারতাম না। কিন্তু ঐ আগ্রহ
খুবই ক্ষীণ এবং সীমিত। তা নাহলে
অচিরাৎ পূর্ণতার লক্ষ্যে আমরা পৌঁছে
যেতাম। সুতরাং মনুষ্য জীবনে সীমাবদ্ধ
সক্ষমতার জন্য প্রকৃত পরিচালক বা গুরুর প্রয়োজন।

(শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ)